আধুনিক যুগের ইতিহাস



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসরণে
১৯৮৩ সাল থেকে প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।
[*Vide Circular No Syll/82/5, Dated September 21, 1982.*]

আধুনিক যুগের ইতিহাস

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

মদনমোহন আচার্য, এম. এ. [ট্রিপল] ; বি. টি.
সহশিক্ষক [ইতিহাস বিভাগ] ; রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর।

বি. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানী
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
অরুণকুমার সরকার
বি. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

মূল্য ঃ চোদ্দ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
নেপালচন্দ্র পান
সোনালী প্রেস
২এ, ভোলানাথ পাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

॥ তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হল। বইটি শিক্ষক মহাশয়/শিক্ষিকা মহাশয়াদের কাছে সাদরে গৃহীত হওয়ায়, তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। পূর্ববর্তী সংস্করণের যাবতীয় ত্রুটি এই সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির গুণমান বিচারের ভার সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়/শিক্ষিকা মহাশয়াদের হাতেই রইল। তাঁদের যুক্তিযুক্ত উপদেশ-নির্দেশ সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের অষ্টম শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের জন্য ইতিহাসের যে নতুন পাঠ্যক্রম রচনা করেছেন তাতে আধুনিক পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে ঘটনাবহুল বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা বড় একটা সহজ কাজ নয়। তথাপি শিক্ষকতার কাজে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সূত্রে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সানুগ গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে তার মধ্যেই যথাসম্ভব প্রতিটি অধ্যায় লেখা হয়েছে এবং আনুষঙ্গিক নির্দেশাবলীও যথাযথ পালিত হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থটি সহৃদয় শিক্ষকবৃন্দের কাছে যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করলে এবং যাদের জন্য এটি রচিত, সেই সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগলে প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

● ১. আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ কাকে বলে ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাস সদা পরিবর্তনশীল। আমরা এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পড়েছি। এখন আমাদের জানতে হবে আধুনিক যুগের ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাস জানার আগে আমাদের জানতে হবে 'আধুনিক যুগ' কথাটির অর্থ কী।

আমরা জেনেছি, ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে তুর্কীদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের এই যুগ পরিবর্তন একদিনে হয় নি বা এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এই পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে, সকলের অলক্ষ্যে। যতদিন না আমাদের জীবনধারায়, চিন্তা-ভাবনায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় ততদিন আমরা বুঝতে পারি না একটি যুগের সঙ্গে আর একটি যুগের পার্থক্য কী।

সুতরাং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দকে ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূচনা-কাল বলা হলেও এই যুগের প্রভাব অনুভব করতে সময় লেগেছে। তাই ঐতিহাসিকদের মত হল, ১৪৫৩ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৫০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে আধুনিক যুগের সূচনা-কাল এবং ঐ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে **আধুনিক যুগ** বলা হয়।

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ আধুনিক যুগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয় ইউরোপের অর্থনীতিতে। এই যুগে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ইউরোপের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। মধ্যযুগে যে সামন্ত প্রভুরা ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তাঁদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। যারা ছিল ভূমিদাস, ক্রমাগত শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের ফলে তারা সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেকে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন প্রজারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। অপর দিকে রাজার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতকাল যে রাজারা সামন্তদের ওপর সবদিক দিয়ে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও রণনিপুণ সৈন্যবাহিনী গঠন করে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, দ্রুত শিল্পায়ন, ইত্যাদির ফলে নতুন ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

সামন্তদের পিছনে ফেলে ক্রমশঃই এগিয়ে যেতে থাকেন। সামন্তদের অধীনস্থ অনেক সম্পন্ন চাষীও চাষ-আবাদ ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প শ্রমিকের কাজে লাগেন। ক্রুসেডে অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এ সবের ফলে সামন্ত অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং সামন্ততন্ত্র দ্রুত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

সামন্তযুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষিপ্রধান গ্রামগুলি ছিল স্ব-নির্ভর। এই স্ব-নির্ভর অর্থনীতিক ধ্বংস ডেকে আনল ইউরোপের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপের অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে একদিকে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, মিলান প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রধান শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও অবাধ হওয়ায় নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বিনিময় প্রথা উঠে যায়; মুদ্রার মাধ্যমে জিনিসপত্রের বেচাকেনা চলতে থাকে।

সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ এবং নতুন অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে আরও একটি বিষয়; তা হল কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি। এ সময় নতুন নতুন কৃষি-যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়—যেমন ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, খুরপী, নিড়ানী প্রভৃতি। বায়ুচালিত যন্ত্র দিয়ে জমিতে জলসেচের প্রচলন শুরু হলে অনেক অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আসে। কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথা চালু হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ফসলের চাষ শুরু হয়—যেমন নানা জাতের শাক-সবজি, তিল, তিসি, যব, তুলো, আখ, লেবু জাতীয় ফল, পীচ ফল প্রভৃতি। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এইসব নতুন ফসলের কোনো কোনোটি ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন তুলো থেকে সুতো হয়; ফলে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়। কৃষিকাজ লাভজনক হওয়ার ফলে কৃষকেরা বেশী ফসল ফলাতে শুরু করে। চাষবাসের খরচ মিটিয়ে, জমির খাজনা দিয়ে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকত তারা তা নিজেদের ভোগে লাগাত। এতে উপকৃত হয় ছোট ছোট জমির মালিকেরা। তারা চাষবাসের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিজেরাই কৃষিকাজ শুরু করলে অসংখ্য কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়। এই সব ভূমিহীন কৃষক জীবিকার সন্ধানে দলে দলে গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। সেখানে কেউ-বা কায়িক পরিশ্রম করে আবার কেউ বা নতুন গড়ে ওঠা কলকারখানায় মজুরের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে থাকে। এভাবে সমাজে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়—একটি পুঁজিবাদী শ্রেণী, যাঁরা প্রভূত ধন সম্পত্তির মালিক; অপরটি ভূমিহীন নিঃস্ব চাষী অথবা শ্রমিকশ্রেণী।

কৃষির ক্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে নানাবিধ জিনিস-পত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে দেখা যায় বেশী পরিমাণে জিনিসপত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। এ সময়ে লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। বড় লোহার পিণ্ড কয়লার চুল্লীতে গালিয়ে ঢালাই লোহা এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈরী হতে থাকে। লোহার সঙ্গে সঙ্গে খনিগর্ভ থেকে তামা, টিন ও অন্যান্য ধাতুর উত্তোলন শুরু হয়; সে সব দিয়ে তৈরী হতে থাকে নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম, যেগুলি শিল্পোৎপাদনের পক্ষে সহায়ক। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে নানা শিল্পসম্ভার উৎপন্ন হতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাজারের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়। এক দেশের উদ্বৃত্ত ফসল এবং শিল্পদ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানী হতে থাকে। এভাবেই শুরু হয় অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য। এর প্রভাবে দেশে দেশে গড়ে উঠল নতুন নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, বিপণন কেন্দ্র প্রভৃতি। মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করল আধুনিক যুগের বণিকগোষ্ঠী। এভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল, যথা বিত্তবান ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব ঃ আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন এল তার ফল হল সুদূরপ্রসারী। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির জায়গায় যে অর্থনীতির সূচনা হল তার নাম পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র। এই অর্থনীতির একদিকে বণিক গোষ্ঠী কলকারখানার মালিক অন্য দিকে কারিগর এবং শ্রমিক শ্রেণী। মালিকপক্ষের চেষ্টা হল অল্প মজুরী দিয়ে বেশী মুনাফা অর্জন করা। আর শ্রমিক শ্রেণীর চেষ্টা হল কোনক্রমে গায়ে-গতরে খেটে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে বেঁচে থাকা। এভাবে সামন্ততন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে যে আধুনিক যুগের সূচনা, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নব নব পন্থা উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্রুত অগ্রগতি এবং তারই পরিণতি স্বরূপ শুরু হয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ। একদিকে পুঁজিপতি ও বিত্তবান মানুষ, অন্য দিকে শ্রমজীবী ও বেকার এই দুই-ই মিলে গড়ে ওঠে আধুনিক যুগের সমাজ।

অনুশীলনী

১। আধুনিক যুগ কাকে বলে? এই যুগের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

২। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় কীভাবে শুরু হয়েছিল?

৩। ইতিহাসের একটি যুগকে আর একটি যুগ থেকে কীভাবে পৃথক করা যায়, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪। কৃষিপদ্ধতির উন্নতি কীভাবে সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ ও নতুন অর্থনীতির সূচনা করে ?

৫। যে যে কারণে সামন্তযুগের শেষ দিকে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ দাও।

৬। কোন্ কোন্ ঘটনা ইউরোপীয় অর্থনীতির পরিবর্তন সূচিত করে ?

৭। ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তশীল অর্থনীতির ফল কী হয়েছিল ?

৮। (ক) পুঁজিবাদ বলতে কী বোঝ ? (খ) কীভাবে সমাজে বেকার ও শ্রমজীবী মানুষের উদ্ভব হয় ?

৯। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) —— খৃস্টাব্দকে ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূচনাকাল বলা হয়।

(খ) —— যুগের অবসানে আধুনিক যুগের শুরু।

(গ) সামন্ত যুগের অর্থনীতি ছিল ——।

(ঘ) ক্রুসেড বা —— ইউরোপের অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন আনে।

১০। (ক) আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপের তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম কর।

(খ) এ সময়ের কয়েকটি কৃষিদ্রব্য ও কয়েকটি শিল্পদ্রব্যের উল্লেখ কর।

(গ) সামন্ত অর্থনীতির অবসানে ইউরোপে কোন্ অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল ?

১১। নীচের সঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরগুলির পাশে কাটা (×) চিহ্ন দাও।

(ক) সামন্তযুগের কৃষিপ্রধান গ্রামগুলি ছিল স্ব-নির্ভর [ ]

(খ) ১৫০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে প্রাচীন যুগ বলা হয়। [ ]

(গ) কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়। [ ]

(ঘ) মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের স্থান দখল করল আধুনিক বণিকগোষ্ঠী। [ ]

(ঙ) আধুনিক যুগের শুরুতে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার রুদ্ধ হয়ে যায়। [ ]

● ২. ইউরোপে নবজাগরণ

নবজাগরণ কী ঃ ফরাসী শব্দ রেনেসাঁস-এর আক্ষরিক অর্থ হল নবজাগরণ। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইউরোপের চিন্তা ও ভাবজগতে এক মহা আলোড়ন উপস্থিত হয়। প্রচলিত ধারণা বা অন্ধ বিশ্বাস নয়, সব কিছুকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে নিতে শিখল এ যুগের মানুষ। সব কিছুকে জানবার অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল তাদের মধ্যে। এরই ফলশ্রুতিতে ইউরোপের চিন্তা ও ভাবজগতে, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তাই **রেনেসাঁস বা নবজাগরণ** নামে পরিচিত।

ইউরোপে নবজাগরণের স্বরূপ ঃ ইউরোপে এই নবজাগরণ কিন্তু একদিনে আসেনি। দ্বাদশ শতাব্দীতে সামন্তপ্রথার দ্রুত অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের সূচনা হয়। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা হত। এই বিদ্যাচর্চা শিক্ষার্থীদের চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন আনে। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থার খোলস ছেড়ে তারা স্বাধীন চিন্তার জগতে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে যিনি পথিকৃৎ, তিনি হলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **পিটার আবেলার্ড**। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী আবেলার্ড ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন কোনো মতবাদ বা ধারণাকে চার্চের নির্দেশ বা ঈশ্বরের বিধান বলে গ্রহণ না করতে। যতক্ষণ না যুক্তি-তর্ক দ্বারা কোনো ধারণা বা মতবাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সঙ্গে মিলেছিলেন সমকালীন আরও অনেক পণ্ডিত। এভাবে শিক্ষালয়গুলি সর্বপ্রথম ইউরোপে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

আরও একটি ঘটনা যা নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তা হল ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে তুর্কীদের আক্রমণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলের পতন। অনেকের মত অনুযায়ী এই সময়কেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা-কাল হিসাবে ধরা হয়। এর কারণও আছে। সমসাময়িক কালে কনস্টাণ্টিনোপল ছিল গ্রীক ও রোমান শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র কেন্দ্র। তুর্কী আক্রমণে কনস্টাণ্টিনোপলের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিরাপত্তার কারণে সেখানকার জ্ঞানীগুণী মানুষেরা এই শহর ছেড়ে ইতালি, ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন এবং এই সব স্থানে নতুন বসতি গড়ে তোলেন। তাঁরা আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা মূল্যবান

গ্রীক ও রোমান পুঁথিপত্র। তাঁরা এ সব জায়গায় এসে আবার নতুন উৎসাহে সাহিত্য শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করেন। ইউরোপের অনেক দেশ বিশেষ করে ইতালি এই সব জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানায়। এঁদের অনেককেই শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হয় নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একদিকে এই সব শিক্ষকের মনীষা, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা—এই দুই-এ মিলে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা পুনরায় শুরু হয়।

এই চর্চার ফলে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান পাঠের ফলে ইউরোপের মানুষ নতুন আলোর সন্ধান পায়। তখন থেকে মানুষ বুঝতে শেখে কেবল সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে সব কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে উচিত কর্ম। মানুষ আরও বুঝতে পারে, কেবল ধর্মীয় ব্যাপার বা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। এই পৃথিবীর নানা বিষয় জানা এবং পার্থিব ভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গীর্জার অনুশাসনকে এখনকার মানুষ আর ভয় পেত না বা ধর্মযাজকদের আশ্বাস-বাণী আর তাদের মন ভরাতে পারত না। তার চেয়ে মুক্ত মন এবং পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি আগ্রহ তাদের অধীর করে তোলে। সংক্ষেপে, মানুষের মনে এই সব নব নব চিন্তাধারার উদ্ভবই হল **নবজাগরণ**।

নবজাগরণের আদিকেন্দ্র ইতালি : ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইতালিতে। কালক্রমে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ক্রুসেডের সময় থেকেই ইতালির বিখ্যাত বিখ্যাত শহর রোম, ভেনিস, মিলান, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। এই সব শহরের অধিবাসীরা ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। ফলে নবজাগরণের স্পর্শ সর্বপ্রথম লেগেছিল এঁদের মনে। এ ছাড়া ইতালির ঐ বিখ্যাত শহরগুলি প্রথম থেকেই ছিল সামন্তদের প্রভাবমুক্ত। তাই এই সব শহরের বিত্তবান বণিক সম্প্রদায় নবজাগরণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে একে ছড়িয়ে দিয়েছিল ইতালি তথা ইউরোপের সর্বত্র। এদেরই উৎসাহে ও অর্থানুকুল্যে ইতালির বিভিন্ন শহরে সাহিত্য ও শিল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিল ইতালির **ফ্লোরেন্স**। এই নগরের অধিবাসীরা ছিলেন স্বাধীনতাপ্রিয়, শিক্ষানুরাগী ও শিল্পরসিক। এঁদের মধ্যে দুই বিত্তশালী নাগরিক ছিলেন **কসিমো** এবং **মেডিসি**। প্রথমজন ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ ছিল মেডিসির অন্যতম কীর্তি। ঐ দুই ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে

ফ্লোয়েন্সের বড় বড় অভিজাত পরিবার ও বণিক সম্প্রদায় প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ফ্লোরেন্স দ্বিতীয় এথেন্সের মর্যাদা লাভ করে। ফ্লোরেন্সের এই গৌরবে অনুপ্রাণিত হয় ইতালির ভেনিস মিলান, রোম এবং অন্যান্য নগরের নাগরিক ও শাসক সম্প্রদায়। ফ্লোরেন্সের দেখাদেখি



তাঁরাও গ্রীক দার্শনিক, পণ্ডিত ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন। মিলানের শাসক মিলানকে মণ্ডিত করেন অপূর্ব শিল্প-সুষমায়। রোমের **পোপ** নিও রোম নগরীকে গড়ে তোলেন শিল্পকলা ও শিক্ষার এক সমৃদ্ধ কেন্দ্ররূপে।

ইতালিতে নবজাগরণ প্রথম শুরু হওয়ার আর একটি কারণ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। প্রথম থেকেই এই শিক্ষালয়গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যা যথা রোমান আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। ফলে রেনেসাঁসের মূল সুরটি ধরে নিতে এদের অসুবিধা হয় নি। ইতালির জনসাধারণও নিজেদের প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মনে করতেন। তাই এগুলির পুনরুজ্জীবনে তাদেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল সর্বাধিক। এসব কারণেই ইতালি হচ্ছে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আদি কেন্দ্র।

কালক্রমে ইতালির এই নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হল আলপস পর্বতের অপর প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে। জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ নবজাগরণের প্রভাবপ্রসূত নতুন শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তাভাবনার পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডও এর প্রভাব মুক্ত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে রাজারাও রেনেসাঁসের ভক্ত হয়ে ওঠেন। অনেকের মতে ইতালির নবজাগরণকে যিনি ইতালীর বাইরে অন্যান্য দেশে সম্প্রসারিত করেন তিনি হলেন **এগ্রিকোলা** নামক জনৈক ইতালীয় পণ্ডিত। তিনি ছিলেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অন্যান্য যাঁরা ইতালীয় পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে তাঁদের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটান তাঁদের মধ্যে **উল্লেখযোগ্য** হচ্ছেন ফ্রান্সের

রাজা **প্রথম ফ্রান্সিস,** স্পেনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** ও ইংলণ্ডের রাণী **প্রথম এলিজাবেথ।** ইংলণ্ডে নবজাগরণের আর একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন **কবি চসার,** ইংলণ্ডের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে যাঁর দান ছিল অসামান্য। **ডেভেণ্টার** নামে এক স্কুল-সমিতি নেদারল্যাণ্ডে নবজাগরণের সূচনা করে। ইতালীয় শিল্পীদের সাহায্যে এবং শিল্পের অনুকরণে এদেশে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শিল্পকলা। পর্তুগালে নবজাগরণের প্রভাব দেখা যায় **ক্যামেওনস্** রচিত **'লুসিয়াড'** শীর্ষক মহাকাব্যে। **ফ্লাণ্ডার্সের** চিত্র-শিল্পীরাও ইতালীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় নতুন নতুন শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হন। এভাবে ইউরোপের সর্বত্রই দেখা যায় নবজাগরণের জোয়ার। সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান-চর্চা সবকিছুই যেন নতুন প্রাণ স্পন্দনে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

চিন্তার জগতে নবজাগরণ—মানবতাবাদের জন্ম ঃ ইউরোপে নবজাগরণ আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা, তাঁরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও নজর দিতেন। এঁরা পাপপুণ্য ও পরকাল নিয়ে যতটা না চিন্তা করতেন, তার থেকে মানুষের ইহজীবনের ভোগসুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করতেন বেশী। তাঁদের কথায়, চিন্তায় ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষেরই প্রাধান্য ছিল। এইসব সংস্কৃতিবান তীক্ষ্মবুদ্ধি মানুষ যুক্তির দ্বারা প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসকে খণ্ডন করে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে সকলকে সচকিত করে তুললেন। দেববাদের পরিবর্তে জন্ম নিল **মানবতাবাদ।** মানুষের অপরাজেয় মহিমা প্রচার হল এই মতবাদের মূল লক্ষ্য। আর যাঁরা এই মহান মানবতাবাদের স্রষ্টা তাঁরা পরিচিত হলেন মানবতাবাদী নামে।

ইউরোপে বিশেষতঃ ইতালিতে নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। ধর্মের প্রভাবকে অতিক্রম করে মানুষের জয়গান প্রচার করাই ছিল এই সব সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যিকরা নিজ নিজ মাতৃভাষাকেই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের মাতৃভাষাই কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। আবার এই সব মানবতাবাদী সাহিত্যিকের অধিকাংশের জন্মস্থান ছিল ইতালি। ফলে সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাতও ইতালিতে হয়। পরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডে এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয়।

ইতালির সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর নাম স্মরণীয়, তিনি ছিলেন কবি

দান্তে। তাঁর জন্ম ফ্লোরেন্স নগরে। ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হল '**ডিভাইন কমেডি**' নামক মহাকাব্য। সমসাময়িক যুগের প্রচলিত ধ্যান ধারণার সমালোচনা এবং স্বর্গ ও মর্ত্যে তাঁর কাল্পনিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। 'ডিভাইন কমেডি' ইতালীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই কাব্যটি দান্তেকে সাহিত্য জগতে অমর করে রেখেছে।



দান্তে

কবি **পেত্রার্ক** ছিলেন ইউরোপীয় নবজাগরণের আর একজন পুরোধা। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রকৃতি। মধ্যযুগীয় ধর্মচিন্তাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দেন নি। পরিবর্তে মানবপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুখী জীবনের কথা শুনিয়ে তিনি মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন। দান্তের মত পেত্রার্কও তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থা শিক্ষানীতি ও জীবন দর্শনের সমালোচনা করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। তাই তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্র পাঠ করে নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কার করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত।



পেত্রার্ক

রেনেসাঁস যুগের আর এক উজ্জ্বল নাম **মেকিয়াভেলি**। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী এই মানুষটিকে বলা হয় আধুনিক রাষ্ট্রনীতির জনক। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'দি প্রিন্স'। এই বই-এ তিনি রাষ্ট্রনীতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন।

বোকাচিও ছিলেন ইতালির মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের অন্যতম। তিনি ছিলেন পেত্রার্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর গল্পগুচ্ছ '**ডেকামেরন**' বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। ১৩৪৮ খৃস্টাব্দে সারা ইউরোপে যে মড়ক (Black

Death) দেখা যায়, তারই পটভূমিকায় তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। সমসাময়িক কালের ইতালীয় সমাজ ব্যবস্থার সার্থক দর্পণ হিসাবে একে চিহ্নিত করা যায়।


বোকাচিও

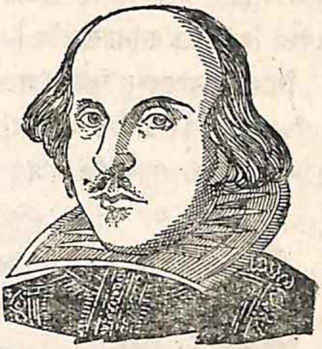
এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হল, তাঁরা সকলেই ইতালির মানুষ। ইংলণ্ডে যাঁরা মানবতাবাদী বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস বেকন, চসার, স্পেনসার এবং সেক্সপীয়রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেকন ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আইনজ্ঞ মনীষী। তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। বেকনের দৃপ্ত ঘোষণা : যা কিছু প্রচলিত নিয়ম তাই চূড়ান্ত নয়। সব কিছুকে বুদ্ধিবিচার দ্বারা গ্রহণ করা কর্তব্য। বেকনের লেখা শ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থ হল **'এ্যাডভান্সমেণ্ট অফ লারনিং'** এবং **'নোভাম্ অরগানম'**। ভাষায়, রচনাশৈলীতে এবং রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রন্থ দুখানি ইংরাজী ভাষার মূল্যবান সম্পদ।


জেয়োফ্রে চসার

ইংরাজী সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন **চসার**। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। তাই রেনেসাঁসের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর কাব্য এবং সাহিত্যে। তাঁর রচিত **'ক্যাণ্টারবেরী টেলস্'** সমসাময়িক ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-দর্পণ। তদানীন্তন খ্রীস্টান ধর্মব্যবস্থার প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা, চার্চের দুর্নীতি, মধ্যবিত্ত ইংরাজ-সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রভৃতি চসার নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

এডমণ্ড স্পেনসার ছিলেন রেনেসাঁস যুগের অপর একজন কবি। স্পেনসারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ **'ফেয়ারী কুইন'** তাঁর সাহিত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গ্রন্থটি পাঠে এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের ছবি পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

স্পেনসারের পরেই আসে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাট্যকার **উইলিয়াম সেক্সপীয়রের** কথা। তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষ। মানুষের জটিল জীবন রহস্যের উদ্ঘাটন করে তিনি মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করে গেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য নাটক হল **'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস'**, **'ম্যাকবেথ'**, **'হ্যা ম লে ট'**, **'টে ম পে স্ট'**, **'জুলিয়াস সীজার'**, **'কীং লিয়ার'** প্রভৃতি। সেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটক ছিল মানবাত্মার জয়গানে মুখর। এলিজাবেথের যুগ তো বটেই, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।



উইলিয়ম সেক্সপীয়র

রেনেসাঁস যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন নেদারল্যাণ্ডের **ইরাসমাস**। তিনি ছিলেন ল্যাটিন, গ্রীক ও রোমান ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর সারা জীবন কাটে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যচর্চায়, দেশভ্রমণে এবং বহু মানুষের সাহচর্যে। সে যুগের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার বাসা বেঁধেছিল, সেগুলির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন। মানুষের অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করে মানুষকে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

স্পেনের **সার্ভেণ্টিস** ছিলেন এ যুগের আর একজন সাহিত্যিক। তাঁর রচিত **'ডন কুইক্সোট'** বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি রূপে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের 'নাইট' এবং তাঁদের বীরত্বের এক ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন।



ফ্রাঙ্কোয়াঁ রেবলো

ফ্রান্সে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যিনি নতুন চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটান তিনি হলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরসিক **ফ্রাঙ্কোয়াঁ রেবলো**। বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মধ্যযুগের অজ্ঞাত কুসংস্কার জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি মানুষের অগাধ আস্থা ইত্যাদিকে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন তিনি তাঁর সাহিত্যে। তাঁর এই সম্পর্কিত রচনা হল **'প্যাণ্টাগ্রয়েল'** ও **'গারগাণ্টুয়া'**।

সাহিত্যের মত নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় এ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলায়। নবভাবনার প্রভাব পড়ে শিল্পীদের শিল্পকর্মে। তার আগের শিল্পকলা ছিল চার্চের নিয়ন্ত্রাধীন। ফলে শিল্পীদের চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা ছিল না। শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ ধর্মীয় ও নানা অবাস্তব বিষয়। ফলে সে সব শিল্প ছিল যেমন নিষ্প্রাণ, তেমনি বৈচিত্র্যহীন। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণের ফলে শিল্পকলারও বন্ধনমুক্তি ঘটল। মধ্যযুগের আড়ষ্ট শিল্পকলা আধুনিক যুগে জীবনমুখী ও বাস্তববাদী শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করল। একালে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে **লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল** এবং **মাইকেল এঞ্জেলোর** নাম উল্লেখযোগ্য।


লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন বহুগুণসম্পন্ন ও বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি। একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি কবি, বিজ্ঞান ও দার্শনিকরূপে তাঁর পরিচয়। তাঁর সৃষ্ট শিল্পকলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের মাধ্যমে জীবনকে ফুটিয়ে তোলা। লিয়োনার্দোর ছবিগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি রূপে পরিগণিত হয়। তাঁর এ ধরণের দুটি বিখ্যাত ছবি হল **'মোনালিসা'** এবং **'দি লাস্ট সাপার।'**

লিয়োনার্দোর সমকালীন আর একজন শিল্পী হলেন **রাফায়েল**। তাঁর অঙ্কিত **'ম্যাডোনা'** (মা মেরীর কোলে শিশু যীশুর ছবি) ছবিটি তাঁকে চিত্রজগতে অমর করে রেখেছে। ভাস্কর্য ও প্রাচীন শিল্পরীতিতেও তাঁর ছিল সমধিক দক্ষতা।

এ যুগের আর একজন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী হলেন **মাইকেল এঞ্জেলো**। তাঁরও ছিল একাধারে স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও কবিরূপে খ্যাতি। তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হল মাতা মেরী ও যীশু-খৃস্টের প্রস্তরখচিত মূর্তি। এ যুগের অন্যান্য শিল্পীর মত মানবদেবতাদের সাধনা ছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।


রাফায়েল

মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চর্চার অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই হয়। কারণ সে যুগে যে

কেউ প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বলতেন তিনিই হতেন ধর্মযাজকদের চক্ষে অপরাধী। রেনেসাঁসের ফলে মানুষের চক্ষে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হয়, অনুসন্ধিৎসা বাড়ে। ফলে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার।



মাইকেল এঞ্জেলো

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা নবজাগরণের উন্মেষ ঘটান তাঁদের মধ্যে **রোজার বেকনের** নাম উল্লেখযোগ্য। বেকন ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ। জাতিতে ইংরাজ। গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, ও রসায়ন বিদ্যায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। নানা প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাকৃতিক রহস্যের-উদ্ঘাটন করে তিনি অনেক প্রচলিত ধারণার অবসান ঘটান। তিনি বলতেনঃ এমন দিন আসবে যখন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে উড়বে, ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই গাড়ী চলবে, পাল ছাড়া নৌকা নদী বা সমুদ্রের বুকে তরতর করে এগিয়ে যাবে।

তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ **'অপাস মাজুস'** পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকদের অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। অসাধারণ বৈজ্ঞানিক মনীষার জন্য বেকন জনসমাজে 'বিস্ময়কর পণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন অপর একজন বিজ্ঞানী। দার্শনিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। এ যুগের অন্যান্য চিন্তাবিদদের মত তিনিও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও প্রচলিত মতবাদ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তি বিচার দ্বারা গ্রহণ করার কথা বলতেন। তাঁর মত হলঃ জ্ঞান-সমুদ্র অপার। মানুষের কাজ হল নিরন্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। তা থেকেই আহরিত হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ইতালির প্রসিদ্ধ শিল্পী **লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি** একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা এবং যন্ত্রবিদ্যায় ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে ওড়ার সম্ভাবনার কথা তিনিও বলেন এবং তার একটি নক্সাও প্রস্তুত করেন। তাঁর আঁকা অনেক ছবি ও নক্সা পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকদের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অনেকে বলেন

ইতালির মিলান শহরে জল সরবরাহের জন্য খাল খননের পরিকল্পনা তিনিই প্রণয়ন করেন। বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য লিয়োনার্দোকে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের সঙ্গে তুলনা করা যায়।



কোপারনিকাস

নবজাগরণ যুগের আর একজন বিজ্ঞানী হলেন **কোপারনিকাস**। তিনি ছিলেন পোল্যাণ্ডের লোক। তাঁর আগে মানুষ মনে করত পৃথিবী স্থির, তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র সবকিছু। কোপারনিকাস দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করে সৌরজগৎ সম্পর্কে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তাঁর এই আবিষ্কার চিন্তাজগতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হন।

কোপারনিকাসের মৃত্যুর পর ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন **গ্যালিলিও**। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি কোপারনিকাসের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে পোপ ও পাদরীরা নাস্তিক ও অশাস্ত্রীয় আখ্যা দিয়ে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু তাতেও গ্যালিলিও এতটুকু দমেন নি। অবিচল সংকল্প ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূত্রে তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।



গ্যালিলিও

নবজাগরণ যুগের আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল **মুদ্রণযন্ত্র** আবিষ্কার। **গুটেনবার্গ** নামে জনৈক জার্মান মনীষী ১৪৫০ খৃস্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এর আগে চীনদেশের লোকেরা কাঠের ওপর অক্ষর খোদাই করে তার ওপর কালি মাখিয়ে বই ছাপার কাজ চালাত। গুটেনবার্গ অক্ষর-বিশিষ্ট ধাতব টাইপ

তৈরী করার কৌশল আবিষ্কার করে মুদ্রণ শিল্পে যুগান্তর আনেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ হল 'ম্যাজারিন বাইবেল'। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় লেখা। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিস্ময়করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। কম খরচে, অল্প সময়ে



গুটেনবার্গ



সেকালের ছাপাখানা

অনেক বই ছাপা হত। ফলে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের পথ সুগম হয়। মানুষ মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে পদার্পণ করে।

অনুশীলনী

১। রেনেসাঁস বলতে কী বোঝ? ইউরোপে এর শুরু কবে এবং কীভাবে হয়?

২। কোন্ কোন্ ঘটনা ইউরোপে নবজাগরণের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে?

৩। ইতালিতে প্রথম নবজাগরণ শুরু হওয়ার কারণগুলি বর্ণনা কর।

৪। ইউরোপের আর কোন্ কোন্ দেশে কীভাবে নবজাগরণের বিস্তৃতি ঘটেছিল?

৫। মানবতাবাদ শব্দটির অর্থ কী? কীভাবে এই মতবাদের উদ্ভব হয়?

৬। ইতালির কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম কর। তাঁদের এই নামে পরিচিত হবার কারণ কী?

৭। রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যে কীভাবে মানবতাবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়?

৮। রেনেসাঁস যুগের শিল্পী ও শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৯। ইউরোপের নবজাগরণ কীভাবে এই মহাদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে প্রভাবিত করেছিল বল।

১০। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) রেনেসাঁসের আন্দোলনকে কে প্রথম ইতালির বাইরে প্রচার করেছিলেন ?

(খ) রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য রচনার মূল বৈশিষ্ট্য কী ?

(গ) মধ্যযুগের শিল্পকলা কিসের প্রভাবাধীন ছিল ?

(ঘ) মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চার পথে কী কী বাধা ছিল ?

(ঙ) এমন একজন শিল্পীর নাম কর যিনি একাধারে শিল্পী, বিজ্ঞানী, কৃষি ও দার্শনিক। তাঁকে কার সঙ্গে তুলনা করা যায় ?

(চ) কে কীভাবে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন ? এর ফল কী হয়েছিল ?

১১। নিম্নোক্ত মনীষীদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

দান্তে, চসার, রাফায়েল, বেকন, কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও।

১২। কে কোন্ দেশের মানুষ বল।

পেত্রার্ক, ইরাসমাস, ফ্রাঙ্কোয়াঁ, রেবলো, মাইকেল এঞ্জেলো এবং গুটেনবার্গ।

১৩। নীচের গ্রন্থগুলির কোন্‌টি কে লেখেন ?

(ক) ক্যান্টারবেরী টেল্‌স ; (খ) ডিভাইন কমেডি ; (গ) লুসিয়াড ; (ঘ) দি প্রিন্স ; (ঙ) ডেকামেরন ; (চ) ফেয়ারী কুইন ; (ছ) ডন কুইক্সোট ; (জ) কীং লিয়ার ; (ঝ) অপাস মাজুস এবং (ঞ) ম্যাকবেথ।

১৪। নীচের শিল্পকীর্তিগুলি কোন্‌টি কার ?

(ক) ম্যাডোনা (খ) মোনালিসা (গ) দি লাস্ট সাপার।

১৫। বন্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ—

(ক) — ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী। (বোকাচিও/ফ্রান্সিস বেকন/লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি)

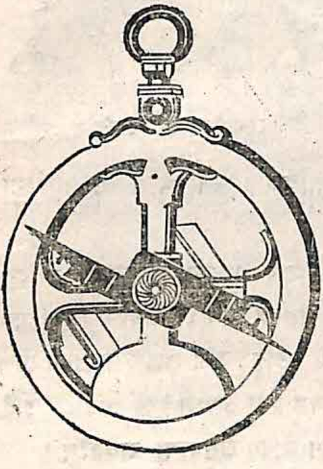
(খ) ইউরোপে রেনেসাঁসের আদি কেন্দ্র —। (জার্মানী/ইতালী/রোম)

(গ) — সেক্সপীয়রের রচিত নাটক। (ডেকামেরন/গারগান্টুয়া/ম্যাকবেথ)

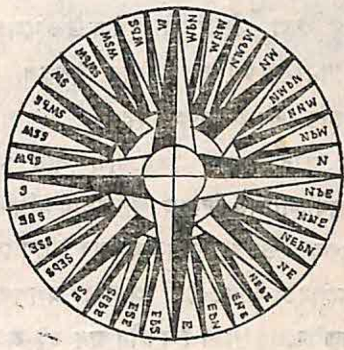
(ঘ) — আধুনিক ছাপাখানার আবিষ্কর্তা। (গুটেনবার্গ/চসার/স্পেনসার)

৩. ইউরোপীয় জগতের ক্রমবিস্তার

ভূমিকা ঃ মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অচেনাকে দেখার, অজানাকে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের কথা তাদের অজানা ছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় আরব বণিকদের কাছ থেকেই তারা এই সব দেশের খবর সংগ্রহ করে। ফলে এই সব দেশে যাওয়ার জন্য তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কৃষি, শিল্পের উন্নতি হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ; ফলে প্রয়োজন হয় নতুন নতুন বাজারের। আবার জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে নানা ধরনের জিনিসপত্রের



এ্যাস্ট্রোলেব



কম্পাস

চাহিদাও বেড়ে যায়। আরব বণিকদের কাছ থেকে তারা জানতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নানা ঐশ্বর্যসম্ভারের কথা। ভিনিসীয় পর্যটক মার্কোপোলো ও আরও নানা পর্যটক চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসে এইসব দেশের সংবাদ ইউরোপীয়দের গোচরে আনেন। ফলে এই সব দেশ সম্পর্কে তাদের মনে গভীর কৌতূহল জেগে ওঠে। তারা চিন্তা করে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাবার। কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং এ্যাস্ট্রোলেব নামক অক্ষাংশ নির্ণায়ক যন্ত্র, মানচিত্রে সমুদ্রে যাওয়ার পথের নিশানা তাদের দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানে প্রেরণা যোগায়। ফলে তারা বেরিয়ে পড়ে দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানে। তাদের এই

সব অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, সেই সব দেশে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

পোর্তুগাল ও স্পেনের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কার : ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল ও স্পেনই প্রথম সামুদ্রিক অভিযানে নেতৃত্ব দান করে। এ বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম করা যায় তিনি হলেন পর্তুগালের রাজকুমার **হেনরি দ্য নেভিগেটর**। তিনি পর্তুগালে একটি নৌ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে ছাত্রদের নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য তিনি সুদক্ষ ইতালীয় নাবিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আনেন। তিনি নিজে অনেকগুলি অভিযান সংগঠিত করেন। এর ফলে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেক অজানা অঞ্চল যথা গিনি উপকূল, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল ও গাম্বিয়া প্রভৃতি দেশ আবিষ্কৃত হয়।



হেনরী দ্য নেভিগেটর

তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে আর একজন পোর্তুগীজ নাবিক **বার্থোলোমিও দিয়াজ** আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে তিনি এক প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ায় আর এগোতে পারেন নি। তবে তাঁর প্রচেষ্টায় প্রাচ্য দেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই পর্তুগালের রাজা **দ্বিতীয় জন** এই অন্তরীপের নামকরণ করেন **উত্তমাশা অন্তরীপ**।

এরপর **ভাস্কো-ডা-গামা** কয়েকজন অনুচরসহ ছোট ছোট চারখানা জাহাজ নিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। পথে অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও তিনি ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যদ্রব্য ও মশলাপাতি নিয়ে ফিরলে পর্তুগালের রাজা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁর এই অভিযানের ফলে একদিকে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের দেশগুলিতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়, অন্যদিকে অপরাপর পোর্তুগীজ নাবিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

দু'বছর পরে ১৫০০ খৃস্টাব্দে **কাব্রাল** নামে আর একজন পোর্তুগীজ নাবিক এক শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে কালিকটে এসে উপনীত হন এবং সেখানে পোর্তুগীজ বাণিজ্য

কুঠী নির্মাণ করেন। ক্রমে পর্তুগাল সরকার ভারতে স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা ভাবেন। ফলে কিছুকালের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়া, দমন,



কলম্বাসের সাণ্টা মারিয়া জাহাজ



ভাস্কো-ডা-গামা

দিউ, পারস্য উপসাগরীয় দ্বীপ ওরমুজ ও মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সব পোর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে আসেন **আলবুকার্ক**।

পোর্তুগীজ নাবিকদের দেশ আবিষ্কারে উৎসাহ পেয়ে স্পেনের কতিপয় নাবিক নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন **কলম্বাস**। স্পেনের রাজার অধীনে মহানাবিকের চাকুরী গ্রহণ করে তিনি মোট চারটি অভিযান পরিচালনা করেন। সেগুলির মধ্যে তৃতীয়টি গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ এই অভিযানের ফলেই আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার হয়। কলম্বাসের ধারণা ছিল আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করলেই বুঝি ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে পেঁছান যাবে। সেই অনুযায়ী তিনি ছোট ছোট কয়েকটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং



কলম্বাস

১৪৯২ খৃস্টাব্দে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছান। তাঁর ধারণা তিনি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছেছেন। সেই অনুযায়ী তিনি এগুলির নামকরণ করেন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Indies)। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে তিনি মানুষের অজানা এক নতুন মহাদেশে এসে উপনীত হয়েছেন। যাই হোক, তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা হয় **পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ**।

কলম্বাসের পর **বালবোয়া** নামে স্পেনের আর একজন নাবিক ১৫১৩ খৃস্টাব্দে পানামা যোজক পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দুই মহাসাগরের রহস্যের উদ্ঘাটন হয়।

যে নাবিক সর্বপ্রথম আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেন (১৫০০ খৃস্টাব্দে) তিনি হলেন ইতালির আমেরিগো ভেসপুচি। তাঁর নামানুসারেই এই মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা। আমেরিগো কলম্বাসের মতই স্পেনের মহানাবিকের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন।

ম্যাগেলান নামক আর একজন পোর্তুগীজ নাবিক স্পেনের রাজার চাকরী গ্রহণ করে কয়েকজন অনুচর নাবিকসহ এক অপেক্ষাকৃত শান্ত সমুদ্রে এসে উপস্থিত হন। তিনি এই শান্ত সমুদ্রের নামকরণ করেন প্রশান্ত মহাসাগর। বালবোয়া যদিও প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধান পান, তবুও এই মহাসাগর জয়ের গৌরব কিন্তু ম্যাগেলানের। সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিক্রমা তাঁরই কীর্তি।



ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল : পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। নানা দেশ মহাদেশে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হলে পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। ম্যাগেলানের পৃথিবী পরিক্রমার ফলে পৃথিবী যে গোলাকার এই তথ্য সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। ইউরোপের জগৎ প্রসারিত হয় এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদেশে। স্পেনীয় নাবিকদের

দেখাদেখি ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ নাবিকগণ দিকে দিকে অভিযান শুরু করে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতে ওঠেন। ফলে দেশে দেশে পোর্তুগীজ ও স্পেনীয় উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ উপনিবেশ। তাঁরা প্রথমে বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ করে নতুন গড়ে তোলা উপনিবেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম।



ম্যাগেলান ও তাঁর জাহাজ

ভৌগোলিক আবিষ্কারের আর একটি ফল হল ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। নব আবিষ্কৃত দেশগুলির অতুল ঐশ্বর্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ইউরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করে। সেই সব ঐশ্বর্য সম্পদ শোষণ করে নিজ নিজ দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। একদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে দিকে দিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক শোষণ এই দুই-এ মিলে ঐ সব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে ইউরোপের বণিকগোষ্ঠী ক্রমশঃই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। নিজেদের আরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তাঁদের রাজাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজারাও বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। রাজশক্তির সঙ্গে বণিকগোষ্ঠীর মিলনে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সব দেশে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের ফলে জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়। এ থেকে জন্ম নেয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি।

প্রাচ্য দেশগুলির মত পাশ্চাত্যের মহাদেশ আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয় স্পেন দেশের নাবিকেরা। এরা প্রথমেই আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই এদের বলা হয় 'কনকুইস্‌টেডরস্‌'। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যেমন—কোর্তেজ, ফ্রান্সিসকো পিজারো, দিয়াগো-দ্য-আলমাগরো। এরা বলপূর্বক মেক্সিকো, পেরু, চিলি প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে স্পেনের উপনিবেশে পরিণত করে। এরা এই সব দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর নির্বিচারে শাসন ও শোষণ চালাতে থাকে। ফলে আমেরিকার অগণিত মানুষকে হয় মৃত্যুবরণ করতে হয়, নতুবা চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়।

অনুশীলনী

১। কী কী কারণে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথ সুগম হয় ?

২। পোর্তুগীজ ও স্পেনীয় নাবিকদের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের ফল কী হয়েছিল ?

৪। হেনরী দ্য নেভিগেটর কাকে বলা হয় ? তাঁদের সম্পর্কে আর কি জান ?

৫। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কলম্বাস ও আমেরিগো ভেসপুচি—কার কী অবদান ?

৬। 'কন কুইসটেডরস্‌' কাদের বলা হয় ? এদের কয়েকজনের নাম কর এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। ইউরোপের আধুনিক কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম কর। কোন পটভূমিকায় এই রাষ্ট্রগুলির জন্ম হয় ?

৮। ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলানের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৯। নিম্নলিখিত খৃষ্টাব্দগুলির কোনটি কী জন্য বিখ্যাত ? ১৪৮৬, ১৪৯৮, ১৫০০।

১০। উপযুক্ত শব্দ বা তথ্য দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) —ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যে প্রথম ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপনীত হন। (খ) আমেরিকার নামকরণ হয় — নামানুসারে। (গ) — প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব টের পান। (ঘ) ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জের নাম স্পেনরাজ — নামানুসারে হয়। (ঙ) সমুদ্রযাত্রার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হল — যন্ত্র। (চ) এঁদের সম্পর্কে কী জান ? বার্থোলোমিও দিয়াজ, আলবুকার্ক ও বালবোয়া।

৪. ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন

আন্দোলনের পটভূমিকা ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ দেখা দেয়, তার প্রভাব পড়ে ধর্মের ওপরও। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইউরোপবাসীদের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ সবই ছিল চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন। পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং সে ভাবেই মানুষের ওপর তাঁদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। কিন্তু ক্রমশঃ এইসব পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। ধর্মচর্চা ও নিরাসক্ত জীবনের আদর্শ পরিত্যাগ করে তাঁরা আরাম ও ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ধর্মগুরু পোপ ও যাজক সম্প্রদায়ের এই ভোগবিলাস, নৈতিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দোষত্রুটি ইউরোপের মানুষদের মনে ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং পোপ ও যাজক সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। তাঁরা ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত এবং চার্চ ও ধর্মগুরু পোপের একাধিপত্য খর্ব করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ইউরোপের ইতিহাসে এই আন্দোলন **ধর্মসংস্কার আন্দোলন** নামে পরিচিত।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি যে সব রাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে সেই সব রাষ্ট্রনায়কের চিন্তা ছিল চার্চের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। পার্থিব বিষয়ের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক বিষয়ের স্থান ; সুতরাং পোপের আসন সম্রাটের ওপরে। ধর্মজগতের এই দাবী সম্রাটরা অস্বীকার করতে থাকেন। ফলে শুরু হয় রাজশক্তির সঙ্গে চার্চের দ্বন্দ্ব। দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বন্দ্ব চলে এবং এর পরিণতিতে চার্চের প্রভাব হ্রাস এবং সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই সব দেশের চিন্তাশীল নায়কগণও চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের কলুষিত জীবনযাত্রার প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কাজে ব্রতী হন। তাই ক্যাথলিক চার্চ ও ধর্মগুরু পোপের ওপর প্রথম আঘাত আসে তাঁদের কাছ থেকেই। সুতরাং দেখা যায়, কি রাজশক্তি, কি চিন্তাশীল ব্যক্তি, সকলের আন্দোলনেরই মূল লক্ষ্য ছিল ক্যাথলিক চার্চ এবং চার্চের প্রতিভূ ধর্মগুরু পোপ।

বাস্তবিকই সে যুগে চার্চ ছিল নানা দুর্নীতি ও অসৎ আচরণের কেন্দ্রস্থল। অর্থ ও ভোগবিলাসের প্রতি যাজক সম্প্রদায়ের ছিল লোলুপ দৃষ্টি। ধর্মের নামে তাঁরা

প্রজাসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন। তাঁরা প্রচার করতেন, যে কেউ যে কোনো পাপকর্ম করুক না কেন, সে যদি তার পাপ স্বীকার করে তাহলে পোপ তাকে ক্ষমা করবেন। এজন্য অবশ্য অপরাধীকে পোপের কাছ থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে ক্ষমাপত্র (Indulgence paper) কিনতে হত। এরপর যে কোনো দুষ্কর্মের স্খালন অথবা ধর্মযাজকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে জনসাধারণকে ক্ষমাপত্র কিনে তবে পোপের রোষদৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে হত। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষের ওপর পোপের এই অত্যাচার এবং নৈতিকতাবর্জিত যাজক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে যারা তাদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিরূপতার সৃষ্টি করে। ফলে শুরু হয় চার্চের বিরুদ্ধে শুদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও চিন্তানায়কদের আন্দোলন। এই আন্দোলন-এর যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁদের মধ্যে জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস এবং মার্টিন লুথারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলেন তাঁর নাম **জন ওয়াইক্লিফ্**। তিনি ইংলন্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ক্যাথলিক চার্চের রাজনীতি ও ক্যাথলিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সোচ্চার হন। পোপের অর্থ-লালসা, গীর্জার মধ্যেকার ভোগবিলাস, ধর্মযাজকদের দুর্নীতি এ সবই ছিল তাঁর আক্রমণের বিষয়। তিনি ইংরাজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বাইবেলের ধর্মতত্ত্ব বুঝতে পারে। তিনি আরও বললেন যে, ধর্ম-যাজকদের সরল, পবিত্র ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষও যদি সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করে তাহলে তারাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়।


জন ওয়াইক্লিফ

ওয়াইক্লিফ তাঁর নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বলা হল **লোলার্ডস**। বাস্তবিকপক্ষে, ওয়াইক্লিফের সময় থেকেই ইংলন্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। এজন্য তাঁকে বলা হয় **ভোরের শুকতারা**।

ওয়াইক্লিফের অনুগামী **জন হাস্‌ও** রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও ধর্মযাজকদের অর্থলিপ্সার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হাস্‌ ছিলেন ওয়াইক্লিফের মত প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু তিনি ওয়াইক্লিফের ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন না। ক্ষমাপত্র বিক্রির বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর। এই অপরাধে তাঁকে বিধর্মী বলে অভিযুক্ত করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

জার্মানীর **মার্টিন লুথার** জার্মানীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথিকৃত। তিনি ছিলেন জার্মানীর উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ধর্মযাজকদের দুর্নীতি, ভোগবিলাস, সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা লুথারের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ধর্মযাজকদের ক্ষমাপত্র বিক্রয়ের ঘটনা তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায় নি। একবার তিনি রোমে যান। সেখানে তিনি পোপ ও যাজকসম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে বিস্মিত হন এবং এই অবস্থার অবসান-কল্পে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় রোমে সেণ্ট পিটার্স গীর্জা তৈরীর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পোপ দশম লিও-র প্রতিনিধি জার্মানীতে আসেন ক্ষমাপত্র বিক্রি করে গীর্জা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে।



মার্টিন লুথার

লুথার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি এই ক্ষমাপত্রের বিরুদ্ধে ল্যাটিন ভাষায় পঁচানব্বইটি প্রবন্ধ সম্বলিত একটি পুস্তিকা রচনা করে উইটেনবার্গ গীর্জায় প্রচার করেন। তাঁর এই প্রচার পুস্তিকার মূলকথা হল, এভাবে অর্থের বিনিময়ে পোপের মার্জনাপত্র কিনে মানুষের পাপের স্খালন হয় না। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ, সৎ, পবিত্র ও সরল জীবন-যাপনের মাধ্যমেই মানুষ তার পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

বলা বাহুল্য, লুথারের এই প্রচার পুস্তিকা দ্বারা পোপের প্রাধান্য অস্বীকার এবং চার্চের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য পোপ দশম লিও শাস্তিস্বরূপ তাঁকে 'পতিত' আখ্যা দেন। এতে কিন্তু লুথার এতটুকু ভয় পেলেন না। পরন্তু তাঁকে শাস্তি দিয়ে পোপ যে হুকুমনামা জারি করেছিলেন তিনি তা সর্বসমক্ষে পুড়িয়ে দেন। লুথার

এরপরও তাঁর পোপ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে তাঁর ছত্রছায়াতলে এসে সমবেত হন। এভাবে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম সংগঠন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়—একটি প্রাচীনপন্থী সংগঠন। এই সংগঠনে পোপ এবং তাঁর অনুগামীরা আগের মতই রোমান ক্যাথলিক নামে নিজেদের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখেন। অন্য সংগঠনের সমর্থক যাঁরা পোপের অস্তিত্ব অস্বীকার করে প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন তাঁরা পরিচিত হলেন প্রোটেস্ট্যান্ট নামে। প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই এই প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের উৎপত্তি। জার্মানিতে এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সূচনা হলেও অল্পদিনের মধ্যে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল ঃ

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল খ্রীষ্টান জগতের ওপর পোপের একাধিপত্যের অবসান। প্রথমে উত্তর জার্মানীতে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হলেও অচিরে জার্মানীর অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জার্মানীতে বহু প্রাচীন মঠ ধ্বংস হয় এবং নতুন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠগুলি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ নামে পরিচিত। জার্মানীর হেস, নিউরেমবার্গ, অগস্‌বার্গ রাজ্যের রাজারা লুথারের মতবাদ গ্রহণ করে নিজ নিজ রাজ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন। জার্মানীর দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে।

ক্রমশঃ জার্মানীর এই সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীর অনুকরণে এই সব দেশে প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যালভিন নামে লুথারের অনুগামী এক পণ্ডিত সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর মতবাদের মূলকথা ছিল সৎ এবং সুশৃঙ্খল জীবন-যাত্রা। যাজক সম্প্রদায়ের অবিচার ও দুর্নীতি এবং রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও তিনি মাথা তুলে দাঁড়ান। তাঁর অনুগামীদের বলা হত ক্যালভিনপন্থী (Calvinists)।

সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে ইংলন্ডেও। ইংলন্ডের রাজা **অষ্টম হেনরী** একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি পোপের খুব ভক্ত ছিলেন। এজন্য পোপ তাঁকে 'ধর্মরক্ষক' (**Henry, The Protector**) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের একটি বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নে তার সঙ্গে পোপের বিরোধ উপস্থিত হয়।

ফলে তিনি ইংলণ্ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ করে গীর্জার ওপর রাজার **কর্তৃত্ব** প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত হেনরীর কন্যা প্রথম এলিজাবেথের সময় এই বিরোধের মীমাংসা হয়। ইংলণ্ডের মানুষ রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট এই দুই ধর্মমতের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। এখানে আর একদল ছিলেন, যাঁরা গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট। এঁরা ছিলেন ক্যালভিনের অনুগামী। এঁরা **'পিউরিটান'** বা **পবিত্রতাবাদী** নামেও পরিচিত ছিলেন।

ইংলণ্ডের মত স্কটল্যাণ্ডেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কাজে অগ্রণী ছিলেন **জন নক্স** নামে অন্য একজন ক্যালভিনপন্থী। স্কটল্যাণ্ডের ক্যালভিন-পন্থীরা **'প্রেসবিটেরিয়ান'** নামে পরিচিত ছিলেন।

ক্যাথলিক গীর্জার প্রতি—ধর্মসংস্কার আন্দোলনঃ ইউরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের সাফল্য ও ক্রমবিস্তারে ক্যাথলিকদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। ক্যাথলিক নেতারা এই ধর্মের ভিতরকার যাবতীয় দুর্নীতি, অনাচার ও কলুষ দূর করে এর হৃতগৌরব ও জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যত্নবান হন। তাঁদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা **পাল্টা ধর্মসংস্কার আন্দোলন বা প্রতি-ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন** নামে পরিচিত।

ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে সবচেয়ে সফল নেতৃত্ব দেন **ইগনেসিয়াস্ লয়ালা** (Ignatius Loyola)। স্পেনের এই সৈনিক সৈনিকের জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। তিনি অতঃপর 'যীশুখৃষ্টের সৈনিক'রূপে নিজের পরিচয় দেন এবং চার্চের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে 'সোসাইটি অফ যীসাস' (Society of Jesus) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার সভ্যদের বলা হত **'জেসুইট'**। সৎচরিত্র অনাড়ম্বর জীবন এবং আনুগত্য এই তিনটি ছিল জেসুইটদের অনুসরণীয় আদর্শ। এঁদের লক্ষ্য ছিল, এই আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের পুনরায় ক্যাথলিক গীর্জায় ফিরিয়ে আনা।

প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আর একটি দিক হল **ইনকুইজিশন কোর্ট** (Inquisition Court) বা পবিত্র ধর্ম-আদালতের গঠন। ক্যাথলিক গীর্জার অভ্যন্তরীণ সংস্কার, যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং ক্যাথলিক ধর্ম বিরোধী সকলপ্রকার কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই আদালত গঠন করা হয়। ক্যাথলিকদের মধ্যে যারা ধর্মবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকত তাদের অনেককে এই আদালত কঠোর শাস্তি দিত; এমন কী অনেককে পুরনো প্রথা অনুয়ায়ী পুড়িয়ে মারা হত। এই আদালতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদেরও দুর্দশার অন্ত ছিল না। আসলে নৈতিক সংস্কারের পরিবর্তে এই পবিত্র আদালত এক নির্যাতনমূলক প্রতিষ্ঠানে

পরিণত হয়। এর ফলে ক্যাথলিকদের প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

ক্যাথলিক ধর্মের পীঠস্থান ইতালিতেও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের কার্যকলাপ শুরু হয়। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পোপ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে আপোষ-আলোচনার জন্য ট্রেণ্ট শহরে খৃষ্টানদের এক সভা ডাকেন। এই সভা **'কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট'** বা **ট্রেণ্ট সভা** নামে পরিচিত। এই সভার অধিবেশন চলে একটানা আঠারো বছর (১৫৪৫-১৫৬৩)। জেসুইট, প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ক্যাথলিক সকল ধর্মমতাবলম্বীই এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মার্জনাপত্রের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি আচরণ বিধিও তৈরী করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ক্যাথলিক চার্চ তার লুপ্ত গৌরব অনেকটাই ফিরে পায়।

ধর্মযুদ্ধ ঃ ইউরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নেতৃত্বে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এবং রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে অনেক দেশেই ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে স্পেনের রাজা **পঞ্চম চার্লস** ছিলেন পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। যেহেতু জার্মানীও ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সেহেতু পঞ্চম চার্লস জার্মান ভূখণ্ডেরও শাসক। ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজারা রোমান ক্যাথলিকদের আধিপত্য খর্ব করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সংঘ (League) গঠন করেন। এই খবর সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছে পেঁছালে তিনি জার্মানী থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রান্সের সাহায্যপুষ্ট প্রোটেস্ট্যাণ্টদের পরাজিত করা তাঁর সাধ্য ছিল না। বেশ কয়েক বছর যুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে **অগস্‌বার্গ-এর সন্ধি** হলে (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ) যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট চার্লস জার্মানীর প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সন্ধি চুক্তিতে আরও উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক জার্মান রাজার অধিকার থাকবে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের ধর্ম কী হবে তা স্থির করার।

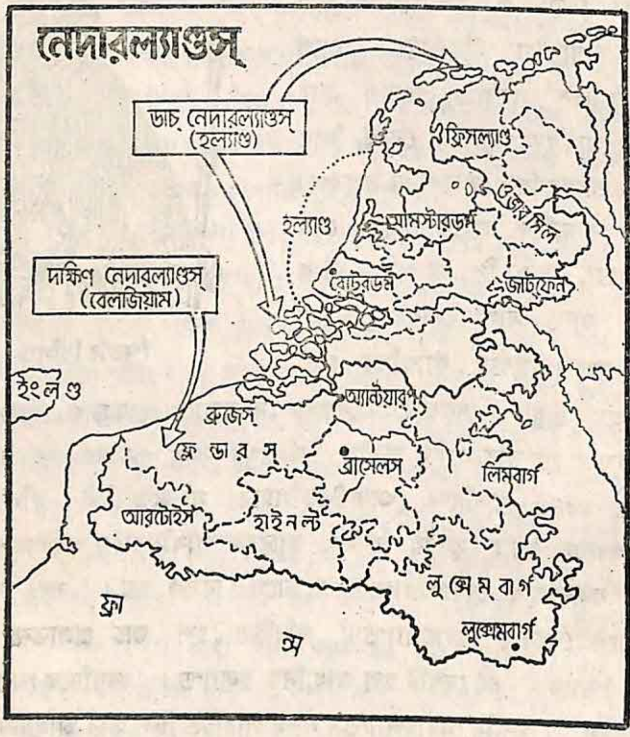
চার্লসের পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপ** স্পেনের সিংহাসনে বসেন। তাঁর মত ক্ষমতাশালী ও ধনী সম্রাট ইউরোপের সমসাময়িক রাজাদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। ধর্মে তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। অথচ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত নেদারল্যাণ্ডস্‌-এর প্রজারা ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট। ফলে নেদারল্যাণ্ডস্‌ থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব মুছে ফেলে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি সেখানকার প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করেন। প্রজাদের করভারে জর্জরিত করে, ইনকুইজিশন আদালতে

অপরাধীদের বিচার করে এবং বিচারে অনেকের প্রাণদণ্ড দিয়ে, মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনে তিনি তাদের দমন করতে চেয়েছিলেন। এর ফল হল বিপরীত। রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ ক্রমশঃ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হল। বিদ্রোহ থেকে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে **ওলন্দাজ** (Dutch) **জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম** নামে পরিচিত। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন **অরেঞ্জ-এর যুবরাজ উইলিয়াম**। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণায় ডাচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বীর-বিক্রমে রুখে দাঁড়ায়। ফিলিপ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারেন নি। তাদের ছিল লৌহকঠিন সংকল্প। "বাঁধ ভেঙে সামুদ্রিক জলের প্লাবনে দেশ ডুবিয়ে দেবো, তথাপি অত্যাচারীর অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াবো না।" বিদ্রোহীরা নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। স্পেনীয় সৈন্যদের নানাভাবে হেনস্তাও করে। দ্বিতীয় ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় ফিলিপের সময় পর্যন্তও এই যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে **ওয়েস্ট-ফেলিয়ার সন্ধিতে** এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অবসান হয়। তৃতীয় ফিলিপ ডাচদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেন। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ নেদারল্যাণ্ডস দুভাগে বিভক্ত হয়। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত উত্তরাংশ স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্ পরিচিত হল **ডাচ প্রজাতন্ত্র** (**Dutch Republic**) নামে। এই দেশটি হল আধুনিক হল্যাণ্ড। অন্যদিকে নেদারল্যাণ্ডস-এর দক্ষিণ অংশ, যা অস্ট্রীয় নেদারল্যাণ্ডস নামে পরিচিত ছিল তার আধুনিক নামকরণ হল **বেলজিয়াম**। বেলজিয়ামের অধিবাসীরা ওলন্দাজদের মত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ না করে পুরনো ক্যাথলিক ধর্মই বজায় রাখল।


দ্বিতীয় ফিলিপ

নেদারল্যাণ্ডস্-কে পুরোপুরি ক্যাথলিক শাসনাধীনে আনার ব্যাপারে দ্বিতীয় ফিলিপ ব্যর্থ হলেও তিনি তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিরোধী নীতি চালিয়ে যেতে থাকেন। এদিকে ইংলণ্ডও সে সময় ইউরোপের নানা দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে নানাভাবে সাহায্য করছিল। ইংলণ্ডের রাণী **প্রথম এলিজাবেথ** ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট। তাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় ফিলিপ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড এবং সেখানকার চার্চকে নিজের

শাসনাধীনে আনার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে ইংলণ্ডে ফিলিপের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের ধ্বংস ও ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। অর্থনৈতিক কারণেও ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের মন কষাকষি চলছিল। ইংলণ্ডের নাবিক ও জলদস্যুরা অনেক সময় স্পেনীয় বাণিজ্য জাহাজ লুটতরাজ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করত। এসব কারণে স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও দু'দেশের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হয়নি। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের পলাতকা রাণী মেরীকে দেশদ্রোহিতার



অপরাধে রাণী প্রথম এলিজাবেথ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে ফিলিপের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। রাণী মেরী ছিলেন ক্যাথলিক। ফিলিপের আশা ছিল রাণী মেরী এলিজাবেথকে হটিয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করলে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। রাণী মেরীর প্রাণদণ্ডাদেশ ফিলিপের সব আশা চূর্ণ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ফিলিপ এলিজাবেথকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা শুরু করেন। স্পেনের এই নৌবহরকে বলা হয় **স্প্যানিশ আর্মাডা (Spanish Armada)**। এরকম বিনা বাধায় এই

নৌবহর ইংলিশ প্রণালীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়। হঠাৎ ড্রেক, হকিন্স প্রমুখ দুর্ধর্ষ ইংরাজ নৌ-সেনাপতি প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে স্পেনের দুর্ভেদ্য নৌবহরকে ধ্বংস করে দেন। ফিলিপের এই পরাজয়ে রাণী এলিজাবেথের বিপদ কেটে যায়। ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষা পায়। বিপন্মুক্ত ইংলণ্ড রাণী এলিজাবেথের নেতৃত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে।

অনুশীলনী

১। 'রিফর্মেশন' বলতে কী বোঝ? ইউরোপে কোন পটভূমিকায় এই আন্দোলন শুরু হয়?

২। মধ্যযুগে চার্চের দুর্নীতির পরিচয় দাও।

৩। ধর্মসংস্কার আন্দোলনে জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাস্-এর অবদান আলোচনা কর।

৪। মার্টিন লুথার কে ছিলেন? তিনি কীভাবে চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন? এর ফল কী হয়েছিল?

৫। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তাদের নাম বল। তাঁরা কীভাবে নিজ নিজ দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন?

৭। প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ সম্প্রদায় কীভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন? এই আন্দোলনের ফল বর্ণনা কর।

৮। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের কারণ কী? কোথায় কোথায় কীভাবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এর ফলাফল কী হয়েছিল?

৯। স্পেনের রাজার নেতৃত্বে নেদারল্যাণ্ডস-এ ধর্মযুদ্ধের বর্ণনা দাও। ঐ যুদ্ধের অবসানে এই দেশের পরিণতি কী হয়েছিল?

১০। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধের কারণ কী? এই বিরোধের ফলাফল বর্ণনা কর।

১১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) 'ক্ষমাপত্র' কী?

(খ) জেসুইট কাদের বলা হয়?

(গ) ক্যালভিন কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে মার্টিন লুথারের মতবাদের পার্থক্য কী ছিল?

(ঘ) 'পিউরিটান' ও 'প্রেসবিটেরিয়ান' কাদের বলা হয়?

(ঙ) 'ইনকুইজিশন কোর্টের' কাজ কী ছিল? এর কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

(চ) কোন্ যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে অগস্‌বার্গ-এর সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? এই সন্ধির শর্ত কী ছিল?

(ছ) আধুনিক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পূর্বনাম কী কী ছিল? কীভাবে এই রাষ্ট্র দুটির উদ্ভব হয়?

(জ) 'স্পানিশ আর্মাডা' কি ? কীভাবে এর ধ্বংস হয় ? এর ফলে কী হয়েছিল ?

(ঝ) প্রোটেস্ট্যান্ট কাদের বলা হয় ?

(ঞ) 'যীশুখৃষ্টের সৈনিক' সম্বন্ধে কী জান ?

১২। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর ঃ

(ক) — কে ভোরের শুকতারা বলা হয়। (খ) ক্যালভিনের অনুগামীদের বলা হয় —। (গ) — খৃস্টাব্দে অগস্‌বার্গ-এর সন্ধি হয়। (ঘ) — খৃস্টাব্দে ওয়েস্ট-ফেলিয়ার সন্ধি হয়। (ঙ) ইংরাজ নৌসেনাপতি — স্প্যানিস আর্মাডা ধ্বংস করেন। (চ) রাণী প্রথম এলিজাবেথ ধর্মে ছিলেন —।

১৩। সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে (×) চিহ্ন বসাও।

(ক) পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলেন জন ওয়াইক্লিফ। [ ]

(খ) মার্টিন লুথার ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। [ ]

(গ) রোমান ক্যাথলিকরা রক্ষণশীল ছিলেন। [ ]

(ঘ) 'ইনকুইজিসন কোর্ট' আসলে এক নির্যাতনমূলক প্রতিষ্ঠান। [ ]

(ঙ) অষ্টম হেনরিকে পোপ 'পতিত' আখ্যা দিয়েছিলেন। [ ]

● ৫. সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বিপ্লব

ইউরোপে নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাব ইংলণ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময়কার ইংলণ্ড ছিল টিউডর রাজাদের অধীন। টিউডর রাজা ও রাণীরা শুধু যে শক্তিশালী ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন সুশাসক এবং প্রজারঞ্জক। এঁদের মধ্যে রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল ছিল সবচেয়ে গৌরবময়। তাঁর আমলে ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট দ্বন্দ্ব, স্পেনের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ইংলণ্ড এক দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। রাণী এলিজাবেথ শক্ত হাতে এই সমস্যার মোকাবিলা করেন। স্প্যানিস আমার্ডা ধ্বংস করে ইংলণ্ডকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের বিরোধ দূর করে ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব সুনিশ্চিত করেন। তাঁর আগেও টিউডর রাজারা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই টিউডর আমলে প্রজারা রাজভক্ত ছিলেন। রাজার কর্তৃত্ব নিয়ে তাঁদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি।

কিন্তু ইংলণ্ডের ধর্মযুদ্ধ শেষ হলে এবং স্পেনের পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে রাজার স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এর আগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে। নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন ছোট ছোট জমির মালিক, বণিক ও ব্যবসায়ী এবং চিন্তাশীল লোকেরা। এঁরা নিজ নিজ স্বার্থে দেশ শাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে রাজশক্তির সংগে প্রজাদের এবং প্রজাদের প্রতিনিধিস্থানীয় পার্লামেণ্টের বিরোধ শুরু হয়।

টিউডর বংশের শাসনের পর ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের শাসন শুরু হয়। সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্ট বংশের শাসনকালে রাজা এবং পার্লামেণ্টের বিরোধ চরমে ওঠে। স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। তাঁরা বিদেশী বলে ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁদের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। ইংলণ্ডের রীতিনীতি সম্পর্কেও এই রাজাদের ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। এদিকে তখনকার পার্লামেণ্টে ছিল পূর্বোক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য। তাঁরা স্টুয়ার্ট রাজাদের ক্ষমতা ও একাধিপত্য খর্ব করাজ জন্য সর্বশক্তি

নিয়োগ করেন। এর পরিণামেই ইংলণ্ড শুরু হয় রাজা এবং পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব।

যে দুজন স্টুয়ার্ট রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁরা হলেন **প্রথম জেমস** এবং **প্রথম চার্লস**। এঁরা বিশ্বাস করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাজশক্তি হল দেবতাপ্রদত্ত শক্তি (**Divine Right**)। এই দৈবশক্তির বলেই রাজা দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং রাজা এবং রাজকার্যের সমালোচনা করার অধিকার প্রজাদের নেই। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজাদের এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। ফল হল, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ। এ ছাড়া স্টুয়ার্ট রাজারা মনে করতেন রাজ্য তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; সুতরাং প্রজার ওপর যেমন খুশী কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজার আছে। এজন্য তাঁরা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামত কর চাপাতেন, ধনীদের থেকে জোর করে ঋণ আদায় করতেন। কেউ প্রতিবাদ করলে বিনা বিচারে তাকে আটক করা হত। অথচ বহুদিন থেকেই নিয়ম ছিল কর ধার্যের আগে রাজাকে পার্লামেণ্টের অনুমতি নিতে হবে। রাজারা সে নিয়ম লঙ্ঘন করে কর ধার্য করতে লাগলেন ; এমন কি শেষ দিকে পার্লামেণ্ট না ডেকেই রাজা দেশ শাসন করতে শুরু করলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যরা দাবী জানালেন যে পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়া কোনো কর আরোপ বা কোনো আইন প্রণয়ন করা চলবে না। রাজা সদস্যদের কথায় কান না দেওয়ায় রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই বেড়ে চলে।

ধর্মীয় কারণেও এই বিরোধ শুরু হয়। সে সময় পার্লামেণ্টের প্রোটেস্ট্যাণ্ট সদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন—অ্যাংলিকান ও পিউরিটান। যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সামঞ্জস্যের নীতি মেনে চলতেন তাঁদের বলা হত অ্যাংলিকান ; আর গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টরা পিউরিটান নামে পরিচিত ছিলেন। পার্লামেণ্টে পিউরিটান সদস্যরা ছিলেন দলে ভারী। তাঁরা প্রথম জেমস বা প্রথম চার্লস কাউকেই পছন্দ করতেন না।

প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস রাজা হন। এ সময় পার্লামেন্টের সদস্যরা রাজার কাজে এক **'অধিকারের আবেদন'** (**Petition of Right**) পেশ করেন। এতে বলা হয় পার্মামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কর বসাতে পারবেন না, ঋণ আদায় করতে পারবেন না, শান্তির সময় সামরিক আইন জারী করতে পারবেন না ইত্যাদি। রাজা কয়েকটি দাবী মেনে নিলেও পার্লামেণ্টের সব দাবী মেনে নিলেন না। বরং পার্লামেণ্টকে এড়িয়ে স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বাবদ রাজার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হলে রাজা

পার্লামেণ্টের দ্বারস্থ হন। সদস্যরা এই অর্থ মঞ্জুর না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং পার্লামেণ্টের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য শাসন করতে মনস্থ করেন। এরপর দীর্ঘ এগার বছরের শাসন কালে (১৬২৯—১৬৪০ খৃঃ) আর তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকেন নি।

১৬৩৯ খৃস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টরা চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজার আবার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে ১৬৪০ খৃস্টাব্দে রাজা আবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন। এবারও তাঁকে ঘোরতর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সদস্যগণ নানাভাবে রাজার ক্ষমতা খর্ব করে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করান। রাজা গত্যন্তর না দেখে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ দাবী মেনে নেন। এমন কি তিনি পূর্বে আরোপিত অবৈধ করসমূহ প্রত্যাহার করে নেন এবং কথা দেন যে ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো কর বসাবেন না।

গৃহযুদ্ধ (Civil War) ঃ চাপে পড়ে সাময়িকভাবে রাজা পার্লামেণ্টের দাবী মেনে নিলেও অতঃপর শক্ত হাতে পার্লামেণ্টের মোকাবিলা করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে তিনি উত্তর ইংলণ্ডে গিয়ে এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর এই যুদ্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ১৬৪২ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

এই গৃহযুদ্ধ চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। এতে সমগ্র ইংলণ্ড দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। রাজার পক্ষে ছিলেন উত্তর ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় এবং পার্লামেণ্টের পক্ষে ছিলেন ছোট ছোট জমিদার আর বণিকগোষ্ঠী। পার্লামেণ্টের অনুগত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন **অলিভার ক্রমওয়েল** নামক পার্লামেণ্টেরই একজন সদস্য। এই গৃহযুদ্ধে একটাই ছিল প্রশ্ন ঃ অতঃপর ইংলণ্ডের শাসন ক্ষমতা দখল করবে কে, রাজা না পার্লামেণ্ট ?

সাত বছর ধরে (১৬৪২—১৬৪৯ খৃঃ) এই গৃহযুদ্ধ চলার পর পার্লামেণ্টের হাতে রাজার পরাজয় ঘটে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রাজা প্রথম চার্লসকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয় (১৬৪৯ খৃস্টাব্দ)।

ক্রমওয়েল ও সাধারণতন্ত্র (Commonwealth) ঃ চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান ছিলেন অলিভার ক্রমওয়েল। রাজার বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেণ্টের অনুগত সৈন্যবাহিনীর

নেতৃত্ব দিয়ে পার্লামেন্টকে জয়যুক্ত করেন। তিনি 'আদর্শ বাহিনী' (**Model Army**) নামে একটি নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং দক্ষতার জন্য তিনি পার্লামেন্টে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এজন্য তাঁর ওপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এই সময়কার ইংলণ্ড নামে প্রজাতন্ত্র হলেও সামরিক ব্যক্তিদের দ্বারাই বেশীর ভাগ শাসিত হত। কারণ ক্রমওয়েল একজন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন ; কিন্তু রাজ্য শাসনের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে শাসনের শুরুতেই তিনি নিজেকে ইংলণ্ডের 'রক্ষক' (**Protector**) বলে ঘোষণা করেন এবং এক নতুন শাসনবিধি অনুযায়ী শাসন কার্য চালাতে থাকেন। পার্লামেন্টকে তিনি আদৌ আমল দিতেন না। প্রজাতন্ত্রের প্রধান হয়েও তিনি পূর্ববর্তী রাজাদের তুলনায় অধিক স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ফলে ইংলণ্ডের মানুষ ভাবতে থাকেন প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা পূর্বেকার রাজতন্ত্রই ভাল ছিল।



অলিভার ক্রমওয়েল

রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। পার্লামেন্টও অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আর এ ব্যবস্থায় আপত্তি করেনি। জনসাধারণের আমন্ত্রণে প্রথম চার্লসের নির্বাসিত পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (**Restoration**) হয়।

গৌরবময় বিপ্লব ঃ পিতা পিতামহের মত দ্বিতীয় চার্লসও স্বৈরাচারী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু পার্লামেন্টের আনুকূল্যে তিনি পিতার সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন, সেহেতু তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে যেতে সাহস করেন নি।

১৬৮৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন। দ্বিতীয় জেমস গোঁড়া ক্যাথলিক এবং রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের খবরদারি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। ফলে আবার তাঁর সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বেধে যায়।

এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ইংলন্ড আবার দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজশক্তির সমর্থক, অন্যদল ছিলেন পার্লামেন্টের স্বার্থে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় জেমস অপুত্রক ছিলেন। তাই ইংলণ্ডের মানুষের আশা ছিল তাঁর মৃত্যু হলে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসবেন তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা ও হল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের পত্নী মেরী। এতে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী ক্যাথলিক শাসনের অবসান ঘটবে। কিন্তু শেষ বয়সে জেমসের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভয় পেয়ে যান যে আবার একজন ক্যাথলিক রাজা হবেন। এই অবস্থায় পার্লামেণ্ট নিয়ম করে যে কোনো স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না। এই নিয়ম অনুসারে মেরীর স্বামী, হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম অফ অরেঞ্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। অসহায় রাজা দ্বিতীয় জেমস প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা না করেই ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পার্লামেণ্টের অনুরোধ অনুযায়ী উইলিয়ম ও মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের এই পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বেচ্ছাচারী রাজবংশের জায়গায় ইংলণ্ডে নতুন রাজবংশের শাসন শুরু হল। এই নিঃশব্দ বিপ্লব ইতিহাসে গৌরবময় বিপ্লব নামে (১৬৮৮ খৃঃ) পরিচিত।

স্টুয়ার্ট রাজাদের শাসনপর্বের শুরু থেকেই রাজার ক্ষমতা নিয়ে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের যে বিবাদ বাধে ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসান হয়। নতুন রাজা উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ "তৃতীয় উইলিয়ম" নাম গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে তিনি অতঃপর পার্লামেণ্টের নীতি নির্দেশ মেনে চলবেন। এ জন্য ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে পার্লামেণ্টে অধিকার বিধি (**Bill of Rights**) নামক এক আইন পাশ হয়। রাজা নতুর বিধিতে স্বাক্ষর দান করেন। এতে পার্লামেণ্টকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইন অনুযায়ী রাজা ঘন ঘন পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকতে রাজী হন। এতে আরও বলা হয়, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কোনো কর ধার্য করতে পারবেন না বা স্থায়ী সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে পারবেন না। পার্লামেণ্টের অবাধ নির্বাচন এবং সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও এই আইনে সুরক্ষিত করা হয়। এ ভাবে ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অবসান হয়, তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের সূচনা হলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পে, বাণিজ্যে, সামরিক শক্তিতে দেশ ইউরোপীয় রাজনীতিতে নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

অনুশীলনী

১। কী কী কারণে ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ শুরু হয় ?

২। 'অধিকারের আবেদন' কাকে বলে ? এর বিষয়বস্তু কী ছিল ? রাজা প্রথম চার্লস কীভাবে একে গ্রহণ করেন ?

৩। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের সূচনা কীভাবে হয় ? কীভাবে এর অবসান হয়েছিল ? এই গৃহযুদ্ধের ফলই বা কী হয়েছিল ?

৪। ইংলণ্ডে কীভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ? এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান কে ছিলেন ? তাঁর কীর্তিকলাপ বর্ণনা কর।

৫। ইংলণ্ডে রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণ কী ? কীভাবে এই রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

৬। গৌরবময় বিপ্লবের পটভূমিকা বর্ণনা কর। এই বিপ্লবের কারণ কী ? এর ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) টিউডর যুগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? (খ) 'অ্যাংলিকান' আর 'পিউরিটান' কাদের বলা হত ? ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধে এঁদের ভূমিকা কী ছিল ? (গ) "এগার বছরের শাসন" কার রাজত্বকালের ঘটনা ? কেন তিনি এই শাসন চালান ? (ঘ) প্রথম চার্লস কেন ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয় ? এই অধিবেশনে কী কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ? (ঙ) গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুই পক্ষে কে কে ছিলেন ? (চ) 'অধিকারের আবেদন' কী ? এতে কী বলা হয়েছিল ?

৮। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) প্রথম চার্লস কোন্ বংশীয় রাজা ছিলেন ? (খ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে রাজার বিপক্ষে পার্লামেন্টের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কে দেন ? (গ) স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (ঘ) কত খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ? (ঙ) ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে কোন আইন পাশ হয় ?

৯। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :

(ক) ইংলণ্ডে — রাজবংশের রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেন্টের বিরোধ চরমে ওঠে।

(খ) — খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে এগার বছরের শাসনকাল বলা হয়।

(গ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে বিবদমান দুই পক্ষ ছিল রাজা এবং —।

(ঘ) ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা — শিরশ্ছেদ করা হয়।

(ঙ) — নিজেকে ইংলণ্ডের 'রক্ষক' বলে ঘোষণা করেন।

(চ) গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে রাজার ওপর — কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০। ঠিক তথ্যের পাশে টিক (✓) এবং ভুল তথ্যের পাশে কাটা (×) চিহ্ন বসাও।

(ক) টিউডর যুগে রাজার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রজাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি। ( )

(খ) স্টুয়ার্ট রাজারা বিশ্বাস করতেন রাজশক্তি হল দৈব শক্তি। ( )

(গ) অলিভার ক্রমওয়েল প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ( )

(ঘ) দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে "রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" রূপে বর্ণনা করা হয়। ( )

(ঙ) ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে 'পিটিশন অফ রাইটস্' আইন পাশ হয়। ( )

১১। ইংলণ্ডের ইতিহাসের নিম্নোক্ত খ্রীস্টাব্দগুলির গুরুত্ব কী?

১৬৪০ ; ১৬৪২ ; ১৬৫৩ ; ১৬৫৮ ; ১৬৬০ ; ১৬৮৫ ; ১৬৮৮ এবং ১৬৮৯।

১২। (ক) দুজন টিউডর এবং দুজন স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজার নাম লেখ।

(খ) এমন একজন ব্যক্তির নাম বল, যিনি কোনো রাজবংশজাত না হয়েও ইংলণ্ডের কর্ণধার হয়েছিলেন।

১৩। খ্রীস্টাব্দ অনুযায়ী ঘটনাগুলি সাজাও :

(ক) রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ; (খ) প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ ; (গ) গৌরবময় বিপ্লব ; (ঘ) ক্রমওয়েলের মৃত্যু।

● ৬. সমকালীন ভারতবর্ষ

[ক] ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ দিল্লীতে সুলতানী শাসনের অবসানে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এশিয়ার ক্ষুদ্র ফরগনা রাজ্যের অধিপতি ওমর শেখ মির্জার পুত্র **জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর**। পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন তৈমুরলঙের এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। এঁরা উভয়েই জাতিতে মোঙ্গল ছিলেন। এই 'মোঙ্গল' শব্দ থেকেই মুঘল কথাটির উৎপত্তি।



বাবর

অনেকদিন থেকেই বাবর মনে মনে দিল্লী জয়ের আশা পোষণ করতেন। শেষে এক গৃহবিবাদের সূত্রে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করতে আহ্বান জানালেন। বাবর কালবিলম্ব না করে দিল্লী আক্রমণ করেন এবং ১৫২৬ খৃস্টাব্দে **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** দিল্লীর শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করেন। বাবার দিল্লী ও আগ্রা দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি **খানুয়ার যুদ্ধে** (১৫২৭ খৃস্টাব্দ) মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে এবং তার দুবছর পরে **গোগরার** যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। ১৫৩০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে যান। পরবর্তী প্রায় দু'শো বছর ধরে সেই সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র **হুমায়ুন** দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল আদৌ সুখের হয় নি। তিনি পিতার মত দক্ষ ও রণকুশল ছিলেন না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল একদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা

বাহাদুর শাহ, অন্যদিকে বিহারের অন্তর্গত সাসারামের আফগান জায়গীরদারের পুত্র **শের খাঁ**। প্রথমে বাহাদুর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শের খাঁ তার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌশলে তাঁকে এড়িয়ে যান। পরে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি বিহারের রোটাস ও চুনার দুর্গ দুটি দখল করেন। তাঁর এই শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু শের খাঁ চৌসা (১৫৩৯ খৃস্টাব্দ) এবং বিলগ্রামের (১৫৪০ খৃস্টাব্দ) যুদ্ধে হুমায়ুনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দিল্লীর মুঘল সিংহাসন দখল করেন। সম্রাট হবার পর তাঁর নাম হয় শেরশাহ।



হুমায়ুন

রাজ্যহারা হুমায়ুন পারস্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে শেরশাহের মৃত্যুর পর আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে হুমায়ুন ১৫৫৫ খৃস্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় অধিকার করেন। পরের বছর এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।



আকবর

হুমায়ুনের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হলেও তাঁর পুত্র **আকবরের** আমলে আবার **মুঘল** সাম্রাজ্যের বিজয়রথ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। মাত্র তেরো বছর বয়সে আকবর পিতার সিংহাসনে বসেন। এ সময় তাঁর অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ। শুরুতেই তাঁকে এক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হতে হয়। আকবরের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে শেরশাহের বংশধর আদিল শাহ শূরের হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিজেকে দিল্লীর সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। আকবর তখন ছিলেন পাঞ্জাবে। এই সংকটকালে অভিভাবক বৈরাম খাঁ আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে হিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খৃস্টাব্দ) হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে আকবর দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করেন।

এরপর আকবর রাজ্য বিস্তারে মন দেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র, জৌনপুর, মালব তাঁর দখলে আনেন। এ সময় বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব তাঁর কাছে অসহ্য মনে হওয়ায় তিনি তাঁকে পদচ্যুত করেন। বৈরাম ব্যর্থ বিদ্রোহ ঘোষণার পর তীর্থযাত্রার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

পরবর্তী প্রায় **চল্লিশ** বছর ধরে একের পর এক রাজ্য জয় করে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি বুঝেছিলেন রাজপুত জাতি শৌর্যে ও বীর্যে সকলের সেরা। তাই তিনি রাজপুতদের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করেন। রাজপুত কন্যাকে বিয়ে করে রাজপুতদের উচ্চপদে নিয়োগ করে তিনি সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহ ছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

রাজপুতদের মধ্যে যিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি, তিনি হলেন রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ শক্তি মেবারের রাণা **প্রতাপ সিংহ**। ফলে আকবর মেবার আক্রমণ করেন এবং ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে **হলদিঘাটের যুদ্ধে** মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার করেন।

মেবার জয়ের পর আকবর পশ্চিমে গুজরাট থেকে শুরু করে পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করেন। এমনকি ক্রমে কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর বেলুচিস্থান, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানসমূহ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ ভারতেও তাঁর সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। এখানকার অধিকাংশ রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। যাঁরা তা করেন নি, তাঁরা হলেন গণ্ডোয়ানার **রাণী দুর্গাবতী** এবং আহম্মদনগরের **চাঁদ সুলতানা**। আকবর এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে এই দুই রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, খান্দেশ ও মুঘল অধিকারে আসে। এভাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হয়।



জাহাঙ্গীর

১৬০৫ খৃস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্র যুবরাজ সেলিম

জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র রাণা অমর সিংহ মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান। জাহাঙ্গীর তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠিয়ে তাঁকে সম্মানজনক শর্তে মুঘল আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। অতঃপর বাংলার বার ভূঁইয়াদের (জমিদার) পরাজিত করে বাংলাকে মুঘল শাসনাধীনে এনে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র খুররম মুঘল সম্রাট হন। তিনি তাঁর পিতার দেওয়া নাম **শাহজাহান** নামেই ইতিহাস পরিচিত। রাজত্বের প্রথমেই তিনি সিংহাসনে বসার উপযোগী তাঁর সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে নিজের অধিকার সুনিশ্চিত করেন। এরপর তিনি বুন্দেলখণ্ডের রাজা এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করে ঐ অঞ্চলে মুঘল শাসন নিরাপদ করেন। তাঁরই আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম আলি ১৬৩২ খৃস্টাব্দে হুগলীর পোর্তুগীজ কুঠি দখল করে ঐ অঞ্চলে পোর্তুগীজদের অত্যাচার ও বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি আহম্মদনগর জয় সম্পূর্ণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যের আর দুটি মুসলিম রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে।



শাহজাহান

শাহজাহানের শেষ জীবন খুব কষ্টে কেটেছিল। তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের মধ্যে মুঘল সিংহাসনের উত্তাধিকার নিয়ে বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভাইদের হত্যা বা বিতাড়িত করে এবং পিতাকে গৃহবন্দী করে **ঔরঙ্গজীব** ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে মুঘল সিংহাসন অধিকার করেন।

পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের ন্যায় ঔরঙ্গজীবও রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি স্বাধীনতাকামী সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে দমন করেন। তাঁর সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার **মীরজুমলা** উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শক্তিশালী অহোমদের পরাজিত করে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তাঁর পরবর্তী বাংলার সুবাদার **শায়েস্তা খাঁ** আরাকানের রাজার কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় এ দুটিকে অনায়াসেই তিনি মুঘল অধিকারে আনেন। ১৭০৭ খৃস্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক রাজ্য এবং পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

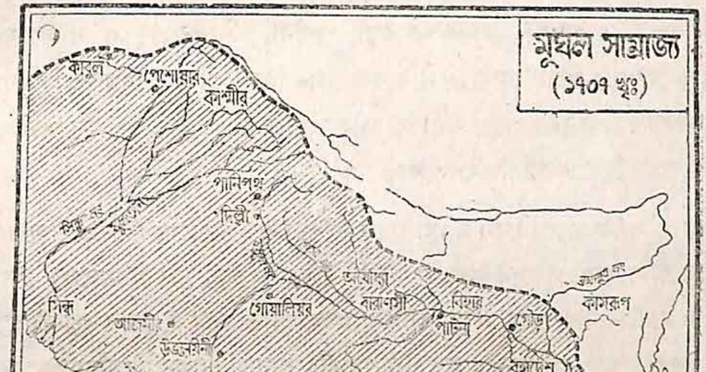

ঔরঙ্গজেব

মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ মুঘল যুগের নানা ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বদাউনির রচনা থেকে এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বিবরণ থেকে সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মুঘল যুগের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এই সমাজব্যবস্থার শীর্ষে ছিল আমীর ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। তারপর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ী, বণিক, চিকিৎসক, পণ্ডিত ও শিল্পী। এদের বলা হত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সমাজে সবার নীচে থাকত সাধারণ মানুষ। অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় যথেচ্ছভাবে টাকাপয়সা খরচ করতেন। তাঁদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতি অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাও আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ছিলেন; কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল সংযত। সবার নীচে ছিল যারা কৃষক, কারিগর, মজুর, তাদের অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না।

ভারতে মুঘল শাসনের শুরু থেকেই হিন্দুধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা সংকীর্ণতা দেখা দেয়। কোনো কোনো মুঘল শাসকের হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতার ফলে হিন্দুধর্মের সামাজিক অনুশাসন আরও কঠোর হয়। পণপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ব্যাপকভাবে সমাজে চালু হয়। কী হিন্দু,

কী মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার কিছুটা সংকুচিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারাই পর্দানশীল ছিলেন।

হিন্দুজীবন ও সমাজ মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা মুসলমানদেরও প্রভাবিত করে। মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা 'সরিফ' অর্থাৎ সমাজের উঁচুতলার মানুষ এবং 'অজলাফ'



যথা নীচুতলার মানুষ। মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিন্দু সমাজকেও প্রভাবিত করে। এইভাবে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠে এক নিবিড় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যা সে যুগে আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ ছিল।

মুঘল যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান এবং গ্রামভিত্তিক। লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি ছিল বেশী। সেজন্য অনেক সময় চাষবাসের উপযোগী জমির তুলনায়

কৃষকের অভাব ছিল। কৃষি পদ্ধতি ছিল সহজ সরল। জমি ছিল উর্বর। তাই অল্প আয়াসে অধিক ফসল উৎপন্ন হত। কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষক ও অন্যান্য সমশ্রেণীর লোকের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকত না।

এ যুগের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর হলেও শিল্প বাণিজ্যেও ভারত ছিল উন্নত। সুতী ও রেশমের বস্ত্র, সোনা রূপার সৌখিন ও সূক্ষ্ম সামগ্রী দেশ বিদেশে রপ্তানী হত। বারাণসী, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, পাটনা, আমেদাবাদ ও বাংলাদেশ ছিল সুতীবস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। ফৈজাবাদ ও খান্দেশ জরীর কাজের জন্য, লাহোর শাল গালিচার জন্য এবং উত্তরপ্রদেশ চিনি শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

জলপথ আবিষ্কারের ফলে মুঘল যুগে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের লেনদেন চলত। ভারত থেকে এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহে সুতী ও মসলিন বস্ত্রসম্ভার, নীল, আফিং, মসলাপাতি. চিনি ইত্যাদি রপ্তানী হত এবং ঐসব দেশ থেকে আমদানী হত চীনামাটির বাসন, মূল্যবান মণিমুক্তা, ভেলভেট, সুগন্ধি তেল ইত্যাদি। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গোয়া, কালিকট, কোচিন, সুরাট, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মসুলিপত্তম, পূর্বভারতের চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, সোনার গাঁ, সপ্তগ্রাম ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর। ফতেপুর সিক্রী, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, আমেদাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ঢাকা, রাজমহল ইত্যাদি ছিল প্রসিদ্ধ শহর। খাবার-দাবার জিনিষপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। সে যুগের এক হিসাবে জানা যায়, এক টাকায় ৫০ সের চাল এবং ২০ সের চিনি পাওয়া যেত। গমের দর ছিল টাকায় পনেরো মন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে যুগের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও ছিল কম। ফলে জিনিষপত্র সস্তা হলেও এ সবই দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল।

মুঘল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। মুঘল সম্রাটগণ শিল্পী ও শিল্পের সমাদর করতেন। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি, আকবরের আমলে নির্মিত শহর ফতেপুর সিক্রী, সেকেন্দ্রায় তাঁর সমাধি, আগ্রার দুর্গ, তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জুম্মা মসজিদ মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শাহজাহানের আমলে মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের চরম বিকাশ ঘটে। ময়ূর সিংহাসন তাঁরই নির্মিত। তাই তাঁর রাজত্বকাল জাঁকজমক ও স্থাপত্য কীর্তির জন্য অধিকতর প্রসিদ্ধ।

মুঘল আমলে চিত্র-শিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। মুঘল সম্রাটদের অনেকেই চিত্রশিল্পের সমঝদার ছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে ছবি আঁকতেন এবং চিত্র সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এযুগের চিত্রকলায় হিন্দু ও মুসলমান রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

মুঘল সম্রাটরা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাই এই যুগে সঙ্গীত শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয়। আকবরের সভাগায়ক তানসেন ও বৈজু ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনেই সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মুঘল যুগে সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়। মুঘল সম্রাটরা প্রায় সবাই সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, হুমায়ুনের জীবনী, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামা সে যুগের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। রামচরিতমানস রচয়িতা হিন্দী কবি তুলসীদাস আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' এ যুগেরই রচনা।

এ যুগে বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করেন। তাঁরা এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ইংলণ্ডের স্যার টমাস রো, র‍্যালফ ফিচ, উইলিয়াম হকিন্স, ফ্রান্সের তাভার্নিয়ে, বার্নিয়ে এবং ইতালির মানুচী।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয়নি। মুঘল সাম্রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। ঔরঙ্গজীবের আমলে যে মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর সময় থেকেই সেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সে পতন সম্পূর্ণ হয়। এর জন্য অবশ্য একাধিক কারণ বর্তমান ছিল।

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে মুঘল সাম্রাজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরও এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চলেছিল। সে সময় এমন কেউ ছিলেন না যিনি শক্ত হাতে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ঔরঙ্গজীবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

সম্রাটদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হয়ে ওঠে। রাজপুত, শিখ ও জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা মুঘল

প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। তাঁদের দমন করা মুঘল সম্রাটদের সাধ্য ছিল না।

আমীর-ওমরাহদের ভোগবিলাস ও দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনযাত্রাপ্রণালীও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকটাই দায়ী। তাঁদের ক্ষমতালিপ্সা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যের চারিদিকে জ্বলে ওঠে অশান্তির আগুন। তাতে বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

ঔরঙ্গজীবের হিন্দুবিদ্বেষী ও রাজপুত বিরোধী নীতিও এই সাম্রাজ্যের পতনে ইন্ধন যোগায়। আকবরের আমলে হিন্দু রাজপুতেরা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। ঔরঙ্গজীবের অনুদার নীতির ফলে তাঁরাই এই সাম্রাজ্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ান।

১৭৩৯ খৃস্টাব্দে নাদির শাহের আক্রমণ এবং ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে আহম্মদ শাহ দুরানীর আক্রমণও ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। তাঁরা অগণিত নিরীহ মানুষকে হত্যা করে গ্রাম ও শহর ধ্বংস করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্য আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

সাম্রাজ্যের বিশালতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার জন্য বাংলায় ইংরেজ বণিকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার নবাবরা দিল্লীর সম্রাটদের নামমাত্র আনুগত্যের বিনিময়ে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকেই এই নিয়ম চলে আসছিল। বাণিজ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের প্রায়ই মন কষাকষি চলত। এই বিরোধ চরমে ওঠে সিরাজ-উদ্-দৌলার সময় থেকেই। এই বিরোধের পরিণতিতে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সিরাজ ইংরাজদের হাতে পরাজিত হন। বাংলায় ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তারপর শুরু হয় ভারতে ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস।

[খ] ১. ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ঃ

১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা সমুদ্রপথে ভারতে আসেন। সেই সঙ্গে জলপথে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আসার পথ প্রশস্ত হয়। এরপর একে একে পোর্তুগীজ বণিকরা এদেশে এসে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন এবং বাংলার হুগলী প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

তাদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য

তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৬০২ খৃস্টাব্দে **ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী** স্থাপিত হয়। ওলন্দাজরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠিগুলির মধ্যে পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে নেগাপত্তম এবং বাংলায় চুঁচুড়া অন্যতম ছিল।

১৬০০ খৃস্টাব্দে গঠিত **ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া** কোম্পানীর রাণী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্য দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন। ১৬০৯ খৃস্টাব্দে **উইলিয়ম হকিন্স** এই কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে ভারতে আসেন এবং মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ সুরাটে ইংরাজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কয়েক বছর পর **স্যার টমাস রো, রাজা প্রথম জেমসের** দূতরূপে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আমেদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইংরাজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি আদায় করেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষ দিকে **জব চার্নক** কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খৃস্টাব্দে)। কয়েক বছর পর এখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়।

ভারতে সবার শেষে ফরাসীরা এসে একে একে সুরাট, মসুলিপত্তন, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর মাহে এবং কারিকলে ফরাসী বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন।

ইউরোপের এই চার বণিকগোষ্ঠী ভারতে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠেন। কালক্রমে ইংরাজদের হাতে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজয় হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয়। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। সে সময় কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সিংহাসনের দাবী নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। ফরাসী শাসনকর্তা **দুপ্লে** ভারতীয় রাজনীতিতে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তারের জন্য কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে দু'জনের পক্ষ অবলম্বন করে অপর দু'জনের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ঘটনাচক্রে দুই রাজ্যেই ফরাসী সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ফলে এই দুই রাজ্যে ফরাসী প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এতে আশংকিত হয়ে ইংরাজরা অপর দুই বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থন জানান। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন **রবার্ট ক্লাইভ**। এদিকে ১৭৪০ খৃস্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। প্রথম, দ্বিতীয়

ও তৃতীয় পরপর তিনটি **কর্ণাটকের যুদ্ধ** হয়। শেষে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে **ওয়ান্দিওয়াসের যুদ্ধে** ফরাসীরা ইংরাজদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এতে একদিকে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে লুপ্ত হয় এবং অন্যদিকে ইংরাজরা ভারতের একচ্ছত্র শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

২. **মারাঠা জাতির উত্থান ও রাজ্যবিস্তার:** শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০) খৃস্টাব্দে পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহজী ভোঁসলে ছিলেন বিজাপুর সুলতানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।



শিবাজী

তাই শিবাজীর বাল্যকাল কাটে মাতা জীজাবাঈ এবং ব্রাহ্মণ গুরু দাদাজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে। ছোটবেলায় মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনে শিবাজীর মনে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। মহারাষ্ট্রে তিনি এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি পার্বত্য মাওয়ালীদের নিয়ে এক দুধর্ষ সেনাদল গঠন করেন এবং বিজাপুরের সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজাপুরের অনেক দুর্গ দখল করে নেন। বিজাপুরের সুলতান সেনাপতি **আফজল খাঁর** নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠিয়েও শিবাজীকে দমন করতে ব্যর্থ হন। শিবাজী তাঁর দস্তানা রূপে ব্যবহৃত একপ্রকার ধারাল অস্ত্র **'বাঘনখের'** সাহায্যে আফজলকে হত্যা করেন। এবার শিবাজী দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের রাজ্যে হানা দিয়ে সেখানে লুটতরাজ চালাতে থাকেন। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজীব শিবাজীকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার **শায়েস্তা খাঁকে** নির্দেশ দেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান চালালে শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে মুঘল সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পালিয়ে যান। শিবাজী পুণা দখল করেন। শিবাজীর এই শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ঔরঙ্গজীব বিশ্বস্ত সেনাপতি **জয়সিংহ** ও **দিলীর** খাঁকে পাঠান। জয়সিংহ শিবাজীকে পরাস্ত করেন। শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** (১৬৬৫ খৃঃ) করতে বাধ্য হন। কয়েকটি

দুর্গ তাঁকে মুঘলদের ফিরিয়ে দিতে হয়। এরপর জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয়। চতুর শিবাজী কৌশলে বন্দী দশা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন। ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে **রায়গড় দুর্গে** তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি **ছত্রপতি** উপাধি গ্রহণ করেন। এরপর মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর প্রভৃতি অনেক নতুন দুর্গ দখল এবং হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুদক্ষ রণকৌশল ও সাংগঠনিক প্রতিভার সাহায্যে শিবাজী যে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গড়ে তোলেন তা প্রায় দেড়শ বছর ধরে ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণ করেন মারাঠারা। কিন্তু শিবাজীর দুর্বল বংশধরগণের হাতে মারাঠা শক্তির আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নি। শিবাজী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন ঔরঙ্গজীব মারাঠাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন নি। শিবাজীর মৃত্যুর পর মুঘলদের সঙ্গে আবার মারাঠাদের যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুঘলরা মারাঠা রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে নেন। শিবাজীর পুত্র **শম্ভুজী** মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র **শাহুকে** মুঘলরা বন্দী করে রাখেন। শম্ভুজী নিহত হলে শিবাজীর আর এক পুত্র **রাজারাম** রাজা হন। ১৭০০ খৃস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ নাবালক পুত্র **তৃতীয় শিবাজীকে** সিংহাসনে বসিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের কিছু অঞ্চলে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ঔরঙ্গজীব অনেক চেষ্টা করেও মারাঠাশক্তিকে দমন করতে পারেন নি। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর শাহু বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান এবং পিতার রাজ্য দাবী করেন। তারাবাঈ তাঁর দাবী অস্বীকার করলে শাহু সাতারায় **দ্বিতীয় শিবাজী** নাম নিয়ে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। এদিকে তৃতীয় শিবাজীর মৃত্যু হলে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই **দ্বিতীয় শম্ভুজী** নাম নিয়ে **কোলহাপুরের** সিংহাসনে বসেন। কালক্রমে তাঁর প্রভাব লুপ্ত হলে সমগ্র মারাঠা রাজ্য শাহুর দখলে আসে।

শাহু ছিলেন অযোগ্য শাসক। যাঁর প্রতিভাবলে তাঁর অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি হলেন **বালাজী বিশ্বনাথ** নামে এক ব্রাহ্মণ। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে শাহু তাঁকে **পেশোয়া** বা **প্রধানমন্ত্রীর** পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর হাতে রাজ্যের সব ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই সময় থেকে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া-শাসন বা পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পেশোয়ারা পুণা থেকে মারাঠা রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

প্রথম পেশোয়া **বালাজী বিশ্বনাথ** অসাধারণ কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাঠাদের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম বাজীরাও** পেশোয়া হন। তিনি ভারতে **হিন্দু পাদশাহী** বা স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মালব ও গুজরাট জয় করেন। কিন্তু মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর অকালমৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বালাজী বাজীরাও** পেশোয়া নিযুক্ত হন। তাঁর সময় মারাঠা রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মারাঠারা পাঞ্জাব দখল করেন। এই সময় আফগানিস্তানের শাসনকর্তা **আহম্মদ শাহ আবদালী** পাঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকার করেন। এতে মারাঠা আফগান সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** (১৭৬১ খৃস্টাব্দ) মারাঠা-বাহিনী আফগানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের মনোবল ও মর্যাদা নষ্ট নয়। মারাঠা সাম্রাজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী পেশোয়া **প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবীশ, মহাদাজী সিন্ধিয়া** প্রমুখ মারাঠা নায়কগণ উত্তর ভারতে মারাঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। মারাঠাদের এই বিপর্যয় মহীশূরে হায়দার আলি, পাঞ্জাবে শিখদের এবং সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

৩. শিখজাতির উত্থান ও সংগঠন : শিখ ধর্মের প্রবর্তক **গুরু নানক** (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ) ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক। তাঁর ধর্মের মূলকথা ছিল সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাঁর অনুচরবর্গ 'শিখ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের আদিগুরু। তাঁর পরবর্তী গুরুদের সুযোগ্য নেতৃত্বে শিখধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। গুরু নানক তাঁর পরবর্তী গুরু মনোনীত করে যান **অঙ্গদকে**। গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খৃঃ) শিখদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতিতে পরিণত করেন। এরপর একে একে শিখদের গুরুপদে বৃত হন **গুরু অমরদাস** (১৫৫২-১৫৭৪ খৃঃ), **গুরু রামদাস** (১৫৭৪-১৫৮১ খৃঃ) এবং **গুরু অর্জুন** (১৫৮১-১৬০৬ খৃঃ)। গুরু অর্জুন শিখদের পবিত্র আদিগ্রন্থ বা **গ্রন্থসাহেব** সংকলন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনায় শিখরা ক্ষুব্ধ হন এবং শিখ-মুঘল সংঘর্ষের সূচনা হয়। শিখরাও নিজেদের সামরিক জাতিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তী গুরু **হরগোবিন্দের** (১৬০৬-৪৫ খৃঃ)

সময় থেকেই এ কাজ চলে। তাঁর পরবর্তী দুই গুরু **হররায়** (১৬৪৫-৬১ খৃঃ) এবং **হরকিষণের** (১৬৬১-৬৪ খৃঃ) সময় বিশেষ কোনো ঘটনা না ঘটলেও শিখরা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। হরকিষণের পর নবম শিখগুরু ছিলেন **তেগবাহাদুর** (১৬৬৪-৭৫ খৃঃ)। ঔরঙ্গজীবের হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি ও ধর্মান্ধতার প্রতিবাদে তিনি বন্দী হন। তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়। তিনি অসম্মত হলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শিখদের মধ্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার করে। শিখদের দশম তথা শেষ গুরু **গোবিন্দ সিংহ** (১৬৭৫-১৭০৮ খৃঃ) পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সংকল্প করেন। তিনি শিখদের নিয়ে এক সংগঠিত সামরিক শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন। ধর্মনৈতিক, সামাজিক কলুষমুক্ত এক নতুন জাতি ও রাষ্ট্র স্থাপন করে শিখদের জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিখদের গুরুপদ উঠিয়ে দেন এবং **'খালসা'**-র সৃষ্টি করেন। খালসা শব্দের অর্থ পবিত্র। খালসায় সকলেই হবে সমান ; জাতি, বর্ণ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কিছুই থাকবে না। শিখরা নামে ও কাজে হবে সিংহ। তাদের প্রতীক হবে **'পঞ্চ ক'**—কেশ, কঙ্কতী (চিরুণী), কৃপাণ, কচ্ছ (খাটো পায়জামা) ও কড় (লোহার বালা)। 'খালসা'র মাধ্যমে গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এক সামরিক জাতিতে পরিণত করেন।


গুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর **বান্দা** নামে এক বিশ্বস্ত নেতা সংঘবদ্ধ শিখদের নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর শিখরা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সমগ্র শিখ অঞ্চলটিকে তাঁরা বারোটি 'মিস্‌ল' বা দলে ভাগ করে নিয়ে এক একটি মিস্‌ল-এর নায়ক হয়ে বসেন। এরূপ একটি মিস্‌লের নায়ক ছিলেন মহাসিংহ।

মহাসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রঞ্জিৎ সিংহ বালক বয়সে পিতার মিস্‌লের দায়িত্ব নেন। অলপকালের মধ্যেই তিনি বিবদমান শিখদের নিয়ে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন

করেন। অমৃতসর ও লুধিয়ানা দখলের পর তাঁর রাজ্যসীমা শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরপর তিনি ঐ নদীর অপর তীরস্থ মিস্‌লগুলি দখলের চেষ্টা করলে ঐ সব মিস্‌লের নায়কগণ রঞ্জিৎ সিংহের বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজরাও তাঁর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত ছিল। কিন্তু ফরাসী আক্রমণের ভয়ে তাঁরা রঞ্জিৎ সিংহের সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে সন্ধি স্থাপনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহও বুঝেছিলেন শক্তিশালী ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই পরস্পরের স্বার্থের কারণে ১৮০৯ খৃস্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরাজদের মধ্যে **অমৃতসরের সন্ধি** স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঠিক হয় যে রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবেন না। এই নদীর অপর পারে তাঁর আধিপত্য ইংরাজরা স্বীকার করে নেন।



রঞ্জিৎ সিংহ

একজন সামান্য মিস্‌ল-এর নায়ক হয়ে অসামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে রঞ্জিৎ সিংহ এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। সুশাসক রূপেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত রাজপদে নিয়োগ করতেন। এজন্য তিনি শিখ, হিন্দু ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি কয়েকজন ফরাসী সেনানায়ক নিযুক্ত করে তাঁর সেনাবাহিনীকে পাশ্চাত্ত্য রণকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি দুর্ধর্ষ উপজাতিদের দমন করে রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত করেছিলেন। আফগানদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য তাঁর রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। সামরিক কৃতিত্ব ও সুশাসনের জন্য ইতিহাসে তিনি 'পাঞ্জাব-কেশরী' নামে খ্যাত।

অনুশীলনী

১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়? 'মুঘল' কথাটির উৎপত্তি কী থেকে হয়েছে?

২। হুমায়ুন ও শেরশাহের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও। তাঁর কৃতিত্ব কী ছিল?

৪। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর উল্লেখ কর।

৫। মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।

৬। মুঘল আমলের সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৮। মুঘল যুগে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে আসেন? তাঁদের বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর।

৯। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ দাও।

১০। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১১। ভারতে 'পেশোয়াতন্ত্রের' সূচনা কীভাবে হয়? প্রথম তিনজন পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১২। ভারতে শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁর শিক্ষার মূল কথা কী? তাঁর পরবর্তী গুরুদের আমলে শিখজাতির উত্থানের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৩। রঞ্জিৎ সিংহ কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

১৪। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:—

(ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

(খ) শেরশাহ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন?

(খ) রাণাপ্রতাপ সিংহ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন?

(ঘ) আকবরের রাজপুত নীতি বর্ণনা কর।

(ঙ) ঔরঙ্গজীব কিভাবে পিতার সিংহাসন দখল করেন?

(চ) মুঘল যুগে নারীর স্থান কী ছিল?

(ছ) কোন্ কোন্ সূত্র থেকে মুঘল যুগের ইতিহাস জানা যায়?

(জ) কোন্ কোন্ বিদেশী পর্যটক মুঘল যুগে ভারতে আসেন?

(ঝ) মুঘল যুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার পরিচয় দাও।

(ঞ) ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব কী?

(ট) শিবাজীর বাল্যজীবন কীভাবে কাটে?

(ঠ) শিবাজীর বংশধরগণের পরিচয় দাও।

(ড) কার কার মধ্যে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

(ঢ) 'পেশোয়া' শব্দটির অর্থ কী? কার সময় থেকে পেশোয়াতন্ত্রের সূচনা হয়?

(ণ) খালসা কাকে বলে ? এর উদ্দেশ্য কী ?

(ত) 'মিস্‌ল' কী ? কীভাবে এর উৎপত্তি হয় ?

(থ) অমৃতসরের সন্ধি কত খৃস্টাব্দে কার কার মধ্যে হয়েছিল ? এই সন্ধির শর্ত কী ছিল ?

১৫। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতা বা সংকলকের নাম লেখ :—

বাবরনামা, হুমায়ুননামা, আইন-ই-আকবরী, রামচরিতমানস এবং গ্রন্থসাহেব।

১৬। শুদ্ধ বাক্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন (√) এবং ভুল উত্তরগুলির পাশে কাটা চিহ্ন (×) দাও।

(ক) শেরশাহ তৃতীয় মুঘল সম্রাট ছিলেন। [ ]

(খ) আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন ; কিন্তু তিনি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। [ ]

(গ) শাহজাহানের রাজত্বকাল জাঁকজমক ও স্থাপত্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত। [ ]

(ঘ) ঔরঙ্গজীব ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী। [ ]

(ঙ) প্রথম বাজীরাও ভারতে হিন্দুপাদশাহী গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। [ ]

(চ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হয়। [ ]

(ছ) গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন দশম তথা শেষ গুরু। [ ]

১৭। মুঘল আমলের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে আকবর এবং ঔরঙ্গজীবের রাজ্যসীমা নির্দেশ কর।

১৮। শিবাজী এবং তাঁর বংশধরগণের এক বংশ তালিকা প্রস্তুত কর।

১৯। মুঘল সম্রাটগণের এক কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন কর।

২০। তাজমহলের একটি মডেল তৈরী কর।

৭. ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

প্রথম পর্যায় (১৮১৮ খৃঃ পর্যন্ত) ঃ ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ঘটেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু খুব বেশীদিন তাঁরা এ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। কালক্রমে বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় রাজনীতির অঙ্গনে। কবির ভাষায়—

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।"

বাংলার নবাব **মুর্শিদকুলি খাঁর** আমলে (১৭১৭-২৭ খৃঃ) ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্কের বিনিময়ে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি পেয়েছিলেন। ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতার **ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ**। মুর্শিদকুলির পরবর্তী নবাব **আলিবর্দী খাঁর** সময়ে ইংরাজগণ দুর্গ সংস্কারের অনুমতি চেয়েও পাননি। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র **সিরাজ-উদ্-দৌলা** বাংলার নবাব হন। এই সময় থেকেই বিভিন্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ শুরু হয়।


সিরাজ-উদ্-দৌলা

প্রথমতঃ নবাব আলিবর্দী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইংরাজরা তাঁর রাজ্যে দুর্গ সংস্কারের অনুমতি চেয়েও পান নি। তাঁর মৃত্যুর পর ইংরাজরা কলকাতায় তাঁদের দুর্গগুলির সংস্কার করেন। নতুন নবাব সিরাজ বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তাঁরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। নবাবের আদেশ অমান্য করে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধারও নানাভাবে অপব্যবহার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, নবাবের বিরুদ্ধপক্ষীয় কর্মচারীর সঙ্গে তাঁরা গোপনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে নবাব মনে মনে ইংরাজদের ওপর দারুণ অসন্তুষ্ট হন। শেষে নবাবের বিরোধী পক্ষের রাজকর্মচারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার অপরাধে সিরাজ ইংরাজদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। তিনি প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন এবং পরে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করেন।

সিরাজের হাতে ইংরাজদের এই পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ এবং সেনাপতি ওয়াটসন একদল সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কলকাতার দিকে যাত্রা করেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কলকাতা পুনরায় দখল করেন। ফলে সিরাজ ও ইংরাজদের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এছাড়া তাঁরা দুর্গ নির্মাণ, বিনা শুল্কে বাণিজ্য পরিচালনা ও নিজেদের মুদ্রা প্রচলন করার অধিকার লাভ করেন।

এতে কিন্তু সিরাজের ইংরাজ বিরোধিতার অবসান হল না। উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করত। উপরন্তু, নবাবের রাজদরবারের কর্মচারীরাই তাঁর বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারীদের নায়ক ছিলেন মীরজাফর। এ ছাড়াও ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণ। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সিরাজকে উৎখাত করে মীরজাফরকে নবাব করা। এর ফলে নবাবের সব রাগ গিয়ে পড়ে ইংরাজদের ওপর। এতে আবার বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে।

এই বিরোধের পরিণতিরূপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে **পলাশীর যুদ্ধ** হয়। এই যুদ্ধে কয়েকজন রাজকর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত এবং পরে নিহত হন। ইংরাজদের প্রচুর উপঢৌকন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা দেবার বিনিময়ে **মিরজাফর** বাংলার নবাব হন। নামে নবাব হলেও আসল ক্ষমতার অধিকারী হন ইংরাজগণ। এভাবে বাংলার রাজনীতিতে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপন এবং একে ভিত্তি করে সমগ্র ভারতে প্রাধান্য বিস্তার—এই হল পলাশীর যুদ্ধের মুখ্য ফল।



মীরকাশিম

ইংরাজদের হাতের পুতুলরূপে বাংলার মসনদে বসলেও মীরজাফরের পক্ষে সে মসনদ বেশী দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ইংরাজদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাঁরা রাজকোষ শূন্য হয়। আরও চাহিদায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি ওলন্দাজদের সঙ্গে

যোগাযোগ করেন। কিন্তু কিছু করার আগেই ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ **বিদেরার যুদ্ধে** ক্লাইভ ওলন্দাজদের পরাজিত করেন। মীরজাফর গদীচ্যুত হন। তাঁর জায়গায় বাংলার মসনদে বসেন মীরজাফরের জামাতা **মীরকাশিম**।

মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাই নবাব হবার পর তিনি ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তিনি অযোধ্যায় আশ্রয় নেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে **বক্সারের যুদ্ধে** ইংরাজরা ত্রি-শক্তির এই মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। বক্সারের যুদ্ধের ফলে বাংলার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ইংরাজ কোম্পানী পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর **দেওয়ানী লাভ** ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে



ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

একটি সন্ধির মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী বিচারের অধিকার লাভ করেন।

পূর্ব ভারতে আধিপত্য স্থাপনের পর ব্রিটিশের লক্ষ্য হল মারাঠা ও মহীশূরের নবাবের রাজ্য অধিকার করা। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের এ দুটি দেশীয় রাজ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রধান অন্তরায়। মারাঠাদের অন্তর্বিরোধের

সুযোগ নিয়ে এবং মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করে এই দুটি রাজ্যও ইংরাজরা জয় করেন।

বাংলায় যখন রাজনৈতিক পালাবদল চলছিল মহীশূরে তখন **হায়দার আলি** নামে এক সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ক সেখানকার হিন্দুরাজাকে পরাজিত করে নিজে ঐ রাজ্যের সুলতান হন। হায়দারের এই শক্তি বৃদ্ধিকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেননি। তাঁরা সে সময়কার দেশীয় নৃপতিদের পারস্পরিক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে মহীশূর রাজ্যটিকে অপর সকলের থেকে পৃথক করেন এবং তারপর যুদ্ধ চালিয়ে এই রাজ্যটিকেও দখল করে নেন।

ইংরাজদের সঙ্গে হায়দর আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের মোট চারটি যুদ্ধ হয়। **প্রথম ইঙ্গ মহীশূর** যুদ্ধে হায়দার ইংরাজদের পরাজিত করেন এবং নিজের দেওয়া শর্তে ইংরাজদের সন্ধি করতে বাধ্য করেন। কিন্তু এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরাজরা মহীশূর রাজ্যে অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে অধিকার করলে হায়দার নিজাম ও মারাঠাদের সহযোগিতায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর** যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের মাঝখানে হায়দার আলির মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র **টিপু সুলতান** যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির** মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হয়। দু'পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। এতে কিন্তু ইংরাজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয় নি। উভয় পক্ষই একে অপরের সম্পর্কে আক্রমণ করলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** শুরু হয়। পেশোয়া ও নিজাম ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম ইংরাজরা অধিকার করলে টিপু **শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি** (১৭৯২ খৃঃ) করতে বাধ্য হন। তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ও ৩৩০ লক্ষ টাকা ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়।

টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের চতুর্থ ও শেষ যুদ্ধ হয় ইংরাজ গভর্নর **লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে**। লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য **'অধীনতামূলক মিত্রতা'** নামে এক নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতির শর্ত ছিল যে যদি কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করে ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে ইংরাজ তাঁর রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এর বিনিময়ে ঐ রাজাকে রাজ্যের মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখতে হবে এবং ঐ সেনাদলের

ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁকে নগদ টাকা বা রাজ্যের কিছু অংশ ইংরাজদের ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া ঐ মিত্র রাজা অন্য কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা করতে বা তাঁর রাজ্যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না। নিজেদের স্বাধীনতার বিনিময়ে ইংরাজদের কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি—এই হল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মূলকথা।

প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া অন্য কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করেননি। টিপুকে এই নীতি গ্রহণ করতে বললে তিনি অস্বীকৃত হন। ফলে ইংরাজরা মহীশূর আক্রমণ করলে **চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** শুরু হয়। টিপু প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন। টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর রাজ্য ইংরাজদের অধিকারে আসে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরায় দূর হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আর এক বাধা ছিল মারাঠারা। **পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে মারাঠা শক্তি বিপর্যস্ত হয়। পরবর্তী পেশোয়া **প্রথম মাধব রাও**-এর আমলে মারাঠারা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কিন্তু মাধবরাও-এর অকাল মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র **নারায়ণ রাও** পেশোয়া পদ লাভ করেন। তিনিও অল্পকালের মধ্যে নিজের **পিতৃব্য রঘুনাথ রাও**-এর ষড়যন্ত্রে নিহত হন। রঘুনাথ নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে **নানা ফড়নবীশ**-এর নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা রঘুনাথ রাওকে বিতাড়িত করে নারায়ণ রাও-এর শিশু পুত্র **দ্বিতীয় মাধব রাওকে** পেশোয়া নিযুক্ত করেন। রাজ্যচ্যুত রঘুনাথ রাও ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হলে, ইংরাজরা রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এতে **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা** (১৭৭৫-১৭৮২ খৃঃ) **যুদ্ধ** শুরু হয়। এই যুদ্ধের অবসান হয় **সলবই-এর সন্ধিতে (১৭৮২ খৃঃ)**। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় মাধব রাও পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হন। রঘুনাথ রাওকে বার্ষিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজরা সলসেট লাভ করেন।

সলবই-এর সন্ধির পর বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা শক্তির ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, গায়কোয়াড় হোলকার প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ পেশোয়ার নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। তাঁদের অনৈক্যের জন্য কোনো সময়ই মারাঠারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। নানা ফড়নবীশ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পেশোয়ার

শক্তি ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল। ১৮০০ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠা রাজ্যে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মারাঠা নায়কদের **প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে** অসহায় অবস্থায় পরবর্তী **পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও** ইংরাজের শরণাপন্ন হন এবং 'অধীনতামূলক **মিত্রতা**' প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহযোগিতায় কোম্পানীর রাজত্ব আক্রমণ করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের** সূত্রপাত হয়। যুদ্ধে মারাঠা নায়কদ্বয় পরাজিত হন। সিন্ধিয়া 'অধীনতামূলক **মিত্রতা**' নীতি গ্রহণ করেন। এরপর শেষ চেষ্টা হিসাবে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অপর দুই মারাঠা নায়ক ভোঁসলে ও হোলকারের সহায়তায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** শুরু হয় (১৮১৭-১৯ খৃঃ)। এই যুদ্ধেও মারাঠাদের পরাজয় ঘটে। পেশোয়ার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ভোঁসলে ও হোলকার ওয়েলেসলীর নীতি গ্রহণ করে ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করেন। এইভাবে **১৮১৮** খৃস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত): ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত **সময়**সীমার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং সমগ্র **ভারতবর্ষ** ব্রিটিশ অধিকারে আসে। এই পর্যায়ে ইংরাজদের নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়।

বড়লাট **লর্ড ময়রার** (১৮১৩-২৩ খৃঃ) শাসনকালে সীমানা বিরোধ নিয়ে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুকাল যুদ্ধের পর গুর্খারা **সগৌলির সন্ধি** (১৮১৬ খৃঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা এবং তরাই অঞ্চলের একাংশ ইংরাজদের অধিকারে আসে।

লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে (১৮২৩-২৮ খৃঃ) **প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে** (১৮২৪-২৬ খৃঃ) জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অংশে ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত হয় এবং সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুদেশ জয় হল ইংরাজদের আর একটি বড় সাফল্য **বড়লাট লর্ড এলেনবোরার** আমলে ইংরাজ সেনাপতি স্যার **চার্লস নেপিয়ার** সিন্ধুদেশের আমীরদের পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিখজাতির নেতা পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন

তিনি ইংরাজদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্র **দলীপ সিংহ** মাতা **ঝিন্দনের** অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসেন। এই সময় প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে খালসা বাহিনী পরাজিত হয়ে **লাহোরের সন্ধি** (১৮৪৬ খৃঃ) করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরাজরা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং কাশ্মীর রাজ্যটি লাভ করেন। লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখারও ব্যবস্থা হয়। লাহোরের সন্ধির এই অপমানজনক শর্ত এবং লাহোর দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্টের উপস্থিতি শিখদের কাছে অসহ্য হওয়ায় তাঁরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় **লর্ড ডালহৌসী** শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৪৮-৪৯ খৃঃ)। প্রথমে **চিলিয়ানওয়ালার** যুদ্ধে ইংরাজরা শিখদের সম্পূর্ণ পরাজিত করতে না পারলেও **গুজরাটের যুদ্ধে** শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারে আসে। খালসা বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পাঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬ খৃঃ) একজন ঘোরতর সম্প্রসারণবাদী গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ভারতে রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি **স্বত্ববিলোপ নীতি** প্রবর্তন করেন। এই নীতির মূলকথা হল, ইংরাজ আশ্রিত কোন রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঐ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হবে। এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, সম্বলপুর ইত্যাদি রাজ্য কোম্পানীর অধিকারে নিয়ে আসেন। কর্ণাটকের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্রদের এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না পারায় তাঁর রাজ্য এবং সিকিমের একাংশ বলপূর্বক ডালহৌসী ইংরাজ অধিকারে নিয়ে আসেন।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ: ১৭৫৭ খৃীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল পরবর্তী একশ বছর ধরে নানা যুদ্ধবিগ্রহ ও ও কূটকৌশলের ফলে সেই সাম্রাজ্য সারা ভারতে বিস্তৃত হয়। এই একশ বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণে ভারতবাসীর মনে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। যেহেতু এই বিদ্রোহ প্রথম প্রথম কোম্পানীর সেনাদলের অন্তর্গত ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু ইতিহাসে এই বিদ্রোহ **'সিপাহী বিদ্রোহ'** নামে খ্যাত। ক্রমে

এই বিদ্রোহ একটা বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়, যে আন্দোলনে রাজা, মহারাজা, জমিদার এমন কী কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিলেন। এজন্য একে মহাবিদ্রোহও বলা হয়। এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক নানা কারণ।



লর্ড ওয়েলেসলী এবং **লর্ড ডালহৌসীর** সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে যেমন দেশীয় রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন, অন্যদিকে এই রাজপরিবারগুলির ওপর নির্ভরশীল অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের

সৃষ্টি হয় এবং সুযোগ উপস্থিত হলে তারাও বিদ্রোহী সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভেঙ্গে দেওয়া দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীর বহু সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীরাও এই বিদ্রোহের সামিল হয়েছিলেন।

বিদ্রোহের মূলে সামাজিক কারণও বর্তমান ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার ঘটনা বা ভারতীয় ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের নিন্দাকে ভারতীয়রা সুনজরে দেখতেন না। এছাড়া সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। এছাড়া রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে গোঁড়া ভারতীয়দের মনে এই আশংকা জাগে যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে ধ্বংশ করাই বুঝি হল ইংরাজ সরকারের আসল উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব নীতি, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রভৃতি কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগায়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংস, বিলাতী দ্রব্যের আমদানীর ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এই সব মানুষের ইংরাজ বিরোধী মনোভাবও মহাবিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়।

কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসম বেতন হার, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রভৃতি নীতির ফলে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। সামরিক কারণে অনেক সময় তাদের বিদেশে পাঠানো হত। ধর্মনাশের ভয়ে একেও তারা ভাল মনে নেয়নি। কখনও কখনও উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীর অত্যাচার তাদের মুখ বুজে সইতে হত। এসব কারণেও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে।

এই সময় নানা কারণে সব শ্রেণীর মানুষের মনে অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তখন এনফিল্ড রাইফেল-এর প্রবর্তন স্ফুলিঙ্গ যোগায়। সৈন্য শিবিরে গুজব রটে যায় যে, এই রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো আছে। এই কার্তুজ রাইফেলে ভরার সময় দাঁত দিয়ে এর আবরণ ছিঁড়তে হত। ধর্মনাশের ভয়ে হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহীগণ এই কার্তুজ ব্যবহার করতে অসম্মত হলে তাঁদের এই কাজে বাধ্য করা হয়। ফলে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

তৎকালে বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের সেনা ছাউনিতে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ায় সিপাহী **মঙ্গল পাণ্ডের** ফাঁসী হয়। অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের প্রসার ঘটে।

মীরাটে বিদ্রোহীরা বহু ইংরাজকে হত্যা করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দিল্লী অধিকার করে বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে** ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, ঝান্সি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ প্রবল আকারে দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নানা সাহেব,


লক্ষ্মীবাঈ


দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

তাঁতিয়া তোপী, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, কুনওয়ার সিং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত নীল, হ্যাভেলক, ক্যাম্পবেল, হিউ রোজ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ এই বিদ্রোহ দমন করে দিল্লীসহ বিদ্রোহীদের অধিকৃত স্থানগুলি পুনরায় দখল করেন। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে চিহ্নিত করেন। আবার কেউ বলেন এটি নিছক বিক্ষুব্ধ সিপাহীদের বিদ্রোহ। এর পিছনে গণসমর্থন ছিল না। অনেকে আবার বলেন, সামন্তগণ এবং দেশীয় রাজারা তাঁদের হৃত সম্পত্তি ও অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এই বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন। যাইহোক, সিপাহীরা প্রথম এই বিদ্রোহ শুরু করলেও তাঁদের মধ্যে এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল এবং নানা স্থানে এই বিদ্রোহ গণসমর্থনও লাভ করেছিল। এর ফলে কোনো কোনো স্থানে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করে। কিন্তু ব্যাপক সমর্থন ও প্রস্তুতির অভাবে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পিছনে নানা কারণ বর্তমান। **প্রথমতঃ** বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের সামনে কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল না। **দ্বিতীয়তঃ** ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব। একদিকে ইংরাজ পক্ষে দক্ষ সেনাপতিগণ অন্যদিকে বিদ্রোহীদের পক্ষে লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, নানাসাহেব, কূনওয়ার সিং



ছাড়া আর কোনো শক্তিশালী দেশীয় রাজা বা নেতার অংশগ্রহণ ছিল না। ফলে ইংরাজ সেনাপতিগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। **তৃতীয়তঃ** কোনো কোনো অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করলেও ব্যাপকভাবে দেশের মানুষের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে নি। **চতুর্থতঃ** প্রচুর রণসম্ভার, রণকৌশল প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সিপাহীরা ইংরাজদের তুলনায় হীনবল ছিল। **পঞ্চমতঃ** যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেও সিপাহীদের পক্ষে

নানা স্থানের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাও ছিল ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণে। তার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা তাদের পক্ষে আদৌ কঠিন হয় নি।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অগাস্ট এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল এরপর থেকে 'ভাইসরয়' বা রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকেন। লর্ড ক্যানিং হলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয়।

ব্রিটিশ শাসনের ফল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ: ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭—এই একশ বছরের শাসনকালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অসন্তোষ ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও কূটনীতির সাহায্যে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে ঐ দেশীয় রাজারা এবং তাঁদের ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে পড়েন।

লর্ড ওয়েলেসলী **"অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি"** প্রবর্তন করে একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করতে থাকেন। লর্ড ডালহৌসীর **স্বত্ব বিলোপ নীতির** ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশের অধিকারে আসে। এই সব অধিকৃত রাজ্যে ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসন ও শোষণের ফলে নিরীহ প্রজাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রাজনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অসন্তোষও ঘনীভূত হতে থাকে। ইংরাজদের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করে ভারতে নিজেদের অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সে সময় কুটিরশিল্প ছিল খুবই উন্নতমানের। বিদেশের বাজারে ঢাকাই মসলিন, ভারতীয় রেশম ও সূতীবস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। ইংরাজরা এই সমৃদ্ধ শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য নানাভাবে উদ্যোগী হন। ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে, কুটিরশিল্প মার খায়, অন্যদিকে এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগর, শিল্পিগণ বেকার হয়ে পড়েন।

ইংরাজ শাসনে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়। করভারে জর্জরিত হয়ে কৃষককুল চাষের জন্য চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন

এবং ঋণভারে জর্জরিত হয়ে প'ড়ত। জমির ওপর প্রজার স্বত্ব না থাকায় যখন তখন তাদের-জমি থেকে উচ্ছেদ করা হত। নীলচাষ লাভজনক হওয়ায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করা হত। এসব কারণে কৃষক ও চাষীদের মনেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

১। ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরোধের কারন কী? এই বিরোধের পরিণাম কী হয়েছিল?

২। পলাশীর যুদ্ধ কেন হয়? এই যুদ্ধের ফল বর্ণনা কর।

৩। ভারতের ইতিহাসে ১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৭৬৫, এই তিনটি সালের গুরুত্ব কী?

৪। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মহীশূর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ দাও।

৫। ইরাজদের সঙ্গে মারাঠাদের মোট কয়টি যুদ্ধ হয়েছিল? এই সব যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। "অধীনতামূলক মিত্রতা" বলতে কী বোঝায়? এই নীতির প্রবক্তা কে? কে প্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন?

৭। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে কোন্ কোন্ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়?

৮। সম্প্রসারণবাদী গভর্নর জেনারেল কাকে বলা হয়? তিনি কীভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেন?

৯। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এই বিদ্রোহ কোথায় কোথায় বিস্তারলাভ করে?

১০। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত?

১১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফল কী হয়েছিল?

১২। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল—এই একশ বছরের ব্রিটিশ শাসনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অসন্তোষের কারণগুলি বর্ণনা কর।

১৩। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) বিদেরার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কার কার মধ্যে হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

(খ) বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে হয়? এই যুদ্ধের ফল বর্ণনা কর।

(গ) সলবই-এর সন্ধি কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত কী ছিল?

(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন দেশীয় নৃপতির নাম কর। এই বিদ্রোহের আগে আর কোন্ কোন্ বিদ্রোহ হয়?

(ঙ) স্বত্ববিলোপ নীতি কে রচনা করেন? এই নীতির শর্তাবলী কী ছিল?

(চ) সিপাহী বিদ্রোহের ফল কী হয়েছিল?

১৪। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

(ক) সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে — সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) — খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে।

(গ) হায়দার আলি ও টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের মোট — যুদ্ধ হয়।

(ঘ) শেষ — ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাও।

(ঙ) — সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বলি।

(চ) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন —।

১৫। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী কালের ক্রমানুসারে সাজাও :

(ক) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

(খ) বিদেরার যুদ্ধ

(গ) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ

(ঙ) পলাশীর যুদ্ধ

(চ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি

(ছ) ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান

(জ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি।

● ৮. অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী : যুক্তিবাদের যুগ

যুক্তিবাদের যুগ : মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখতে পাই কী ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কী সমাজব্যবস্থায় ধর্মেরই প্রাধান্য। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই মানুষ আস্তে আস্তে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের গণ্ডী অতিক্রম করে যুক্তির পথ গ্রহণ করে। তখন থেকে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত নয়। প্রতিটি ঘটনা ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মে, নির্দিষ্ট কারণে। সুতরাং ঘটনার মূলে যে কারণ বর্তমান বা যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটনা ঘটে তার অনুসন্ধানের জন্য মানুষ তার বুদ্ধি এবং মনীষা নিয়োজিত করল। এভাবে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তে এল যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞান। অষ্টাদশ শতকের যা কিছু চিন্তাধারা তার সব কিছুকে প্রভাবিত করেছে এই যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞান। সুতরাং এই যুগকে বলা হয় **যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানের যুগ**। মানুষের মনে যুক্তিবাদের জন্মকাল থেকেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইউরোপের জনমত জাগ্রত হয়। এ থেকেই হয় বিপ্লব। অষ্টাদশ শতকের পৃথিবীতে এরকম তিনটি যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটেছিল, যথা **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, শিল্প বিপ্লব** এবং **ফরাসী বিপ্লব**।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে এই বিশাল মহাদেশটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের অজ্ঞাত ছিল। এখানে তখন যারা বাস করত তাদের বলা হত **'রেড ইণ্ডিয়ান'**। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে এর পরিচয় ঘটল। এই দেশের চমৎকার জলবায়ু, প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ, বাসযোগ্য ভূমি ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংলণ্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষেরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সাধ্য ছিল না এই বিপুলসংখ্যক লোক সমাগমকে ঠেকানোর। প্রথম প্রথম এই নবাবিষ্কৃত মহাদেশে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ গড়ে তোলে। সপ্তদশ শতকে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যেও উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। ফলে এখানেও দেখা যায়, ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষ পর্যন্ত অপর সকল জাতিকে হটে যেতে হয়। রঙ্গমঞ্চে থাকে একমাত্র ইংলণ্ড। এরপর ইংরাজরা দ্রুত একটার পর একটা উপনিবেশ

গড়ে তুলতে থাকেন। ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আমেরিকায় তেরটি ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম: প্রথম অবস্থায় ইংরাজদের নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হত। ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ছাড়া, স্থানীয় আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা এই মহাদেশে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিকদের ব্যাপারে মাথা গলাতেন না। সরকারী ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে আমেরিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা কিছুটা স্বাধীন মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তেরটি উপনিবেশের প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত হলেও এগুলির শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেও বাণিজ্যের স্বার্থে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইংলণ্ডের শিল্পকে বাঁচানোর জন্য উপনিবেশগুলিতে কয়েকটি বিশেষ শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। ইংলণ্ডের জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজে উপনিবেশগুলিতে পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করা যেত না; কয়েকটি বিশেষ পণ্যসামগ্রী একমাত্র ইংলণ্ডেই বিক্রি করার জন্য ঔপনিবেশিকরা বাধ্য থাকতেন ইত্যাদি। এই ধরনের নিষেধাজ্ঞায় ঔপনিবেশিকরা মাতৃভূমির স্বজাতীয় শাসকদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে তখন পর্যন্ত ঔপনিবেসিকদের প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখা দেয় নি। তার কারণ ছিল। ভারতের মত আমেরিকাতেও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল ফরাসী ও ইংরাজ। এই ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করার জন্য ইংরাজ ঔপনিবেসিকদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত ইংরাজের হাতে ফরাসীদের পরাজয় হয় এবং ফরাসীরা আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই সঙ্গে বিজয়ী ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের ওপর নির্ভর করে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। পরন্তু ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৬৩) প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি মেটানোর জন্য বিলাতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঔপনিবেশিকদের কাছে মোটা অংকের অর্থ আদায়ে উদ্যোগী হলে উপনিবেশবাসীরা বাধা দেন। সরকার সে বাধা উপেক্ষা করলে তাঁদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিকরা তাঁদের অধিকার আমেরিকার

পশ্চিমাঞ্চলে বাড়াবার চেষ্টা করলে ইংলণ্ডের কাছ থেকে বাধা আসে। বারবার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বিরোধের ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত, তখন সমসাময়িক কয়েকজন ইংরাজ চিন্তানায়কের চিন্তাধারা ঔপনিবেশিকদের মনে গভীর অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। **লক, হ্যারিংটন,** প্রমুখ ইংরাজ চিন্তানায়কদের রচনায় প্রকাশ পায় প্রতিটি মানুষের কয়েকটি মৌলিক অধিকার আছে, যেগুলি থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কোনো সরকারের নেই। আমেরিকার দার্শনিক **টমাস জেফারসন, টম পেইন** তো সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা লাভে উৎসাহিত করতেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ঔপনিবেশিকদের ওপর **'স্ট্যাম্প কর'** নামে একটা কর চাপালে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করা। ফলে আমেরিকার উপনিবেশবাসীরা এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন।

আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্ট্যাম্প কর প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু অচিরেই ইংলণ্ডের রাজস্ব সচিব টাউনসেণ্ড কাগজ, কাচ, চা প্রভৃতির ওপর নতুন শুল্ক ধার্য করেন। ক্রুদ্ধ ঔপনিবেশিকরা আবার আন্দোলন শুরু করেন। ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৭৭০ খৃস্টাব্দে একমাত্র চা ছাড়া অন্যান্য পণ্যের ওপর ধার্য শুল্ক বাতিল করে দেন। কিন্তু তাতেও বিরোধের নিষ্পত্তি হল না। ঔপনিবেশিকরা স্থির করলেন যে, তাঁরা চায়ের ওপর ধার্য শুল্কও দেবেন না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি জাহাজ বোস্টন বন্দরে এলে কয়েকজন উপনিবেশবাসী ইংরাজ রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে সেই জাহাজে উঠে চায়ের বাক্সগুলি সমুদ্রের জলে ফেলে দেন।

এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা **তৃতীয় জর্জ** এবং **প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ** শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেন। উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ সৈন্য সমাবেশ করা হয়। তাঁদের ওপর শুরু হয় দমন পীড়ন ও অত্যাচার। উপনিবেশবাসীরাও পাল্টা ব্যবস্থা নিলেন। ১৭৭৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তেরোটির মধ্যে বারোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা **ফিলাডেলফিয়া শহরে** এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই ঘোষণাপত্রের সারমর্ম হলঃ সব মানুষই

সমানভাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার পেয়েছে। সেই অধিকারগুলোর মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণের অধিকার। এই অধিকারগুলোর সংরক্ষণের জন্যই মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সরকার, যাদের ন্যায়সম্মত শক্তির উৎস হল শাসিতের সম্মতি। **টমাস জেফারসন** প্রণীত এই ঘোষণাপত্রটিই **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র** (Declaration of Independence) নামে পরিচিত।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে **লেক্সিংটন** শহরে ইংরাজ সৈন্য গুলি চালালে চারিদিকে আগুন জ্বলে ওঠে। উপনিবেশবাসীরা গর্জে ওঠেন। শুরু হয়ে যায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সাত বছর ধরে চলেছিল। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নবগঠিত আমেরিকার সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন **জর্জ ওয়াশিংটন** নামে এক শক্তিশালী ও প্রতিভাবান



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ১৩টি উপনিবেশ

তরুণ। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রণকৌশলের কাছে ইংরাজ সেনাপতি **উইলিয়াম হো** পরাজিত হন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে **"ভার্সাই-এর সন্ধি"** অনুসারে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে। এভাবেই নতুন রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (U.S.A.) উদ্ভব হয়।

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণঃ প্রধানতঃ জর্জ ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্ভুল রণকৌশল আমেরিকাবাসীদের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। দুই দেশের দূরত্বও আমেরিকানদের যুদ্ধজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়েছিল। বিশাল আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর ইংলণ্ড থেকে যুদ্ধসামগ্রী আমেরিকায় আনা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। ফলে নিয়মিত সরবরাহের অভাবে ইংরাজ পক্ষে একাধিক সুদক্ষ সেনানায়ক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। এছাড়া একই সঙ্গে একাধিক শক্তি যথা ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কারোও বিরুদ্ধে জোরদার আক্রমণ হানা ইংরাজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটাও ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব ঃ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উপনিবেশবাসীদের সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঔপনিবেশিকদের উৎসাহিত করে। ফলে পরবর্তীকালে ভারতসহ সব দেশেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। মানুষের কতকগুলি জন্মগত অধিকার ও সমদর্শিতার নীতির প্রতি আমেরিকাবাসীদের বিশ্বাস অন্যান্য উপনিবেশবাসীদের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়। এভাবেই বিশ্বজুড়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরাজদের পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই পরাজয় ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক নীতিরও পরিবর্তন সূচিত করে। তখন থেকে কেবল দমন, পীড়ন, শোষণের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিকদের প্রতি উদার ও সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে ফরাসীরা আমেরিকাবাসীদের সাহায্য করে তাদের জয়ী করলেও এতে নিজেদের রাজকোষ শূন্য হয়। ফলে ফরাসী জনগণের দুর্দশা ও অসন্তোষ বাড়ে। এই অসন্তোষ ও আমেরিকাবাসীদের সাফল্য ফরাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসীদের উৎসাহিত করে। যার ফলে ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল। সর্বোপরি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠা ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে।

[খ] ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব

(১) **শিল্প-বিপ্লবের অর্থ ঃ** অষ্টাদশ শতকের বিশ্বে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল ইংলণ্ডের **শিল্প-বিপ্লব**। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে নানা দেশের আবিষ্কার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে একদিকে যেমন ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে নতুন নতুন নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। এ সবের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কিন্তু গতানুগতিক উৎপাদনরীতির পক্ষে

সে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে মানুষকে নতুন উৎপাদন কৌশল, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির নেশায় পেয়ে বসে। সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কলকারখানা, নির্মিত হতে থাকে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি, আবিষ্কৃত হয় ইঞ্জিনে বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার। এ সবের প্রয়োগ প্রথাসিদ্ধ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তনকেই **শিল্প-বিপ্লব** বলে। এই শিল্পবিপ্লব প্রথম শুরু হয় ইংলণ্ডে পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর দ্রুত বিস্তার হয়।

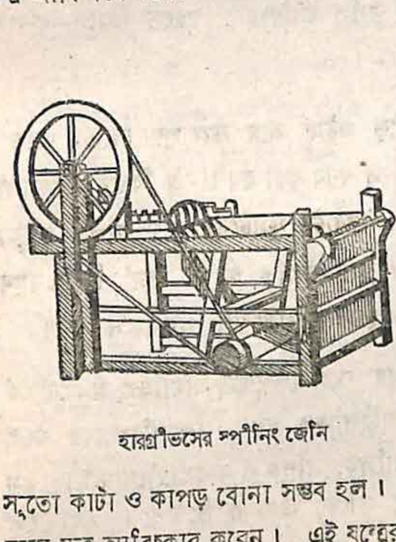
শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে ছিল গৃহশিল্প। ব্যবসায়ীরা কারিগরদের কাঁচামাল যোগান দিত। কারিগর এবং তাদের বাড়ীর লোকজনেরা বাড়ীতে বসেই তৈরী করত নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য। এ কাজে তারা ব্যবহার করত হাতে তৈরী ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। কিন্তু এই পুরনো পদ্ধতিতে কারিগররা সব সময় কাজ পেত না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় ব্যবসায়ীরাও সব সময় তাদের কাঁচামালের যোগান দিতে পারত না। ফলে উৎপাদন মার খেত। অথচ চাহিদা ছিল ক্রমবর্ধমান। তাই ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা কারিগরদের একত্র এনে বড় ঘরে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল দিয়ে অধিক উৎপাদনে উৎসাহ দিতে লাগল। এভাবেই গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট কারখানা। বলা বাহুল্য, এতে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকগুণই বৃদ্ধি পেল। এতেই শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল বলা যায়।

(২) **কৃষিবিপ্লব ঃ** কৃষি ও শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কৃষি ব্যবস্থায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল। আগে যে কারিগর শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত সেই আবার তার জমি চাষ করত। সম্পূর্ণ পুরণো প্রথায়, পুরণো যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ করার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনও ছিল যৎসামান্য। তাতে কোন রকমে চাষীর প্রয়োজন কিছু মিটত। ইংলণ্ডে এই কৃষি ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এল। শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কৃষকরা আখ, তুলো, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিলেন। কারখানায় নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হতে লাগল। বাষ্পচালিত বহুমুখী লাঙল, বীজবোনা ও ফসল কাটা যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। জমিতে সার ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় উৎপাদনও বৃদ্ধি পেল। কৃষিকাজ

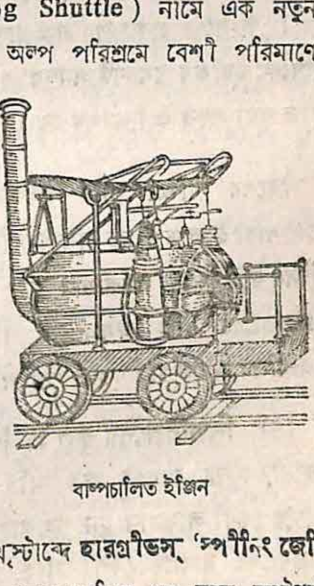
লাভজনক হওয়ায় অনেক পতিত জমিতে চাষ-আবাদ হতে লাগল। একফসলী জমিতে একাধিক ফসল ফলানোর কাজ শুরু হল। এ সবের ফল হল উৎপাদন বৃদ্ধি। সেই বর্ধিত উৎপাদন দিয়ে দেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হল। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রয়াসকেই এক কথায় **কৃষি বিপ্লব** আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

(৩) শিল্পের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ড সারা বিশ্ব জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। বণিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই সব দেশ থেকে সস্তাদরে কাঁচামাল ইংলণ্ডে আমদানী করে তা থেকে নানা শিল্প ও পণ্যসম্ভার তৈরী করে সেগুলিকে আবার চড়াদামে বিদেশের বাজারে বিক্রি করত। এই ব্যবসায়ে লাভ ছিল প্রচুর। এই লাভের অংক আরো বাড়াবার জন্য ব্যবসায়ী তথা উৎপাদকদের চিন্তা হল কী করে কম সময়ে কম অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশী উৎপাদন করা যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারী আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। আর আমরা জানি, প্রয়োজন থেকেই আবিষ্কারের জন্ম। তাই এই সময় থেকেই নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হতে থাকল। এটা শিল্প-বিপ্লবেরই অঙ্গ।

জন কে ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে **ফ্লাইং শাটল** (**Flying Shuttle**) নামে এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এর ফলে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে বেশী পরিমাণে



হারগ্রীভসের স্পীনিং জেনি



বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

সুতো কাটা ও কাপড় বোনা সম্ভব হল। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে **হারগ্রীভস্ 'স্পীনিং জেনি'** নামে যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে একজন শ্রমিক এক সঙ্গে আটগাছি সুতো কাটতে পারত। ফলে কাজের গতি আর পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল।

তাঁত শিল্পে আরও উন্নতি ঘটালেন রিচার্ড আর্করাইড। আর্করাইট ওয়াটার ফ্রেম নামে এক জলচালিত যন্ত্র আবিষ্কার করে জলশক্তির সাহায্যে যন্ত্র চালাবার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে সুতো বেরুতে লাগল তা আগের তুলনায় অনেক সরু ও শক্ত। এই আবিষ্কারের জন্য ইংলণ্ডের রাজা **তৃতীয় জর্জ** আর্করাইটকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। হারগ্রীভস-এর স্পীনিং জেনি এবং আর্করাইটের 'ওয়াটার ফ্রেম' মিশিয়ে **স্যামুয়েল ক্রম্পটন** সুতো কাটার আর এক নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। এর নাম দিলেন **মিউল**। ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে **এডমণ্ড কার্টরাইট** 'পাওয়ার লুম' নামে জলস্রোত চালিত এক কলের তাঁত আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের বয়নশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে।

এ পর্যন্ত কেবল বায়ু অথবা জলশক্তির সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালানো হত। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে **জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় শক্তির** আবিষ্কার শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনল। আগে কাঠকয়লা পুড়িয়ে চুল্লীতে লোহা গলান হত। এতে প্রচুর গাছপালা নষ্ট হত। পরে কোক কয়লার চুল্লী জ্বালিয়ে **আব্রাহাম ডারবি** লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের ফলে জাহাজ, রেলগাড়ী, বড় বড় কল কারখানা প্রভৃতিতে এই শক্তির প্রচলন শুরু হয়। ইংলণ্ডে একের পর এক গড়ে ওঠে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে **হামফ্রে ডেভিস 'সেফটি ল্যাম্প'** বা নিরাপদ বাতি আবিষ্কার করলে কয়লা খনিতে কাজ করা সহজ ও নিরাপদ হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য চলাচল বাড়ে। ফলে সারা ইংলণ্ড জুড়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খনন করা হয়। এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন দুই ইংরাজ **ম্যাকাডাম** আর **ব্রিণ্ডলে**। **রবার্ট ফুলটনের** বাষ্পচালিত নৌকা আবিষ্কারের ফলে জলপথেও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। **জর্জ স্টিভেনসন** রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে পথ পরিবহণ ব্যবস্থায়ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

(৪) **শিল্পবিপ্লবের ফল :** শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হন কলকারখানার মালিক, বণিক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। কম বিনিয়োগের মাধ্যমে বেশী লাভ করা ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ফল হল শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার বৃদ্ধি। এদের নামমাত্র মজুরিতে, দীর্ঘ সময় কলকারখানায় খাটতে হত। এরা সর্বক্ষেত্রেই ছিল মালিকদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশীয় কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এই শিল্পে নিযুক্ত মানুষেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং সামান্য মজুরীর আশায় শিল্পাঞ্চলগুলিতে ভীড় জমাতে শুরু করে। এই সব উপচে পড়া মানুষের বসবাসের জন্য কলকারখানার আশপাশে শ্রমিকদের বসতি গড়ে ওঠে। এই বসতিগুলি ছিল যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি নোংরা। কারখানার কাজ ছিল একঘেয়ে। শ্রমিকদের না ছিল স্বাধীনতা বা কোনো চিত্তবিনোদনের খোরাক। ফলে একটানা কাজের চাপে এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় তারা যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। দারিদ্র ও বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ অনেক সময় সামান্য মজুরীতে স্ত্রীলোক ও কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের কারখানায় নিযুক্ত করতেন।

শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনী ও দরিদ্র, পুঁজিপতি ও শ্রমিক—এঁদের মধ্যে পার্থক্য বেড়েই চলল। প্রথম প্রথম ছাঁটাই বা অত্যাচারের ভয়ে শ্রমিকরা মুখ খুলত না। কিন্তু ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারাও মুখ খুলতে শুরু করল। ফলে দেখা দিল শিল্পে অশান্তি। ক্রমশঃ সেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

[গ] ফরাসী-বিপ্লব

বিপ্লবের পটভূমি—দার্শনিকদের চিন্তাধারা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লবের পটভূমি ছিল ভিন্ন ধরনের। এই বিপ্লবের লক্ষ্য যে কেবল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তা নয়। সে সময়ে ফ্রান্সের সমাজজীবনে যে অর্থনৈতিক শোষণ চলছিল তাকেও সমূলে উচ্ছেদ করা। এ সময়ে ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থায় ছিল দুটি শ্রেণী—(১) অভিজাত ও যাজকদের নিয়ে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং (২) সুযোগ-সুবিধাহীন সাধারণ মানুষ। সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতেন না ; তাঁরা সুরম্য প্রাসাদে নিশ্চিন্ত আরামে দিন যাপন করতেন। আর যাদের পরিশ্রমে তাঁদের উন্নতি তাদের উপর চালাতেন দমন, পীড়ন ও অত্যাচার। এই ধরনের মানুষ ছিলেন সংখ্যায় বেশী এদের মধ্যে আবার যারা কৃষক ও শ্রমিক তাদের দুরবস্থার অন্ত ছিল না।

সমাজব্যবস্থার এই ধরনের বৈষম্য, অবিচার ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয়। চারিদিকে যখন এই ক্ষোভ আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তখন ফ্রান্সের প্রগতিবাদী **ভলতেয়ার, মণ্টেস্কু, রুশো** প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকের আবির্ভাব হয়।

তাঁদের চিন্তায় ও লেখায় ফরাসী জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ ও অসন্তোষ রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানা সমস্যার সমাধানও তাঁদের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

ভলতেয়ার ছিলেন ফ্রান্সে স্বাধীনতা ও প্রগতির একজন প্রধান প্রবক্তা। সে সময়ে ফ্রান্সে যে সমস্ত আচার ও অত্যাচার চলছিল তার প্রতি তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমাজ থেকে সব রকমের অন্যায়, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। গীর্জার দুর্নীতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে যুগে জনসাধারণকে এই সব অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর মত সফলকাম আর কেউ হননি। **'লেটারস অফ দ্য ইংলিশ'** (**Letters of the English**) হল তাঁর বিখ্যাত বই।



মন্টেস্কু

মন্টেস্কু আর একজন ফরাসী চিন্তানায়ক, যিনি বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে সে দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। **'স্পিরিট অফ দ্য লজ'** (**Spirit of the Laws**) নামে তিনি একখানি বই লেখেন। এই বই-এ তিনি রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করেন। মন্টেস্কু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁর রচনায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, শাসন-সংস্কার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে।



রুশো

রুশো ছিলেন এ যুগের আর একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তিনি প্রচার করেন, মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়েই জন্মায়। কিন্তু তারপরই সে সর্বত্র পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হল, সেই শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত স্বাধীন সত্তাকে পুনরুদ্ধার করা। তিনি আরও প্রচার করেন যে, জনগণই হল রাষ্ট্রের

সব শক্তির উৎস। সুতরাং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত না হলে রাষ্ট্রনায়ক বা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে। **সামাজিক চুক্তি (The Social Contract)** নামে রুশো একখানি বই লেখেন। এই বই-এ তিনি মানুষে মানুষে সাম্যের কথা এবং জনগণের সার্বভৌম অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করেন। রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে যে বিপ্লব এনেছিল, ক্রমে তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ ফরাসী বিপ্লব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পিছনে নানা কারণ বর্তমান ছিল। ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্তপ্রথা ভিত্তিক। এ সমাজ ব্যবস্থায় ছিল দুটি শ্রেণী। অভিজাত ও যাজকদের নিয়ে গঠিত সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং সুযোগ-সুবিধাহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ। সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা সুরম্য প্রাসাদে নিশ্চিন্ত ভোগবিলাসে দিনযাপন করতেন। আর যাদের পরিশ্রমে তাঁদের উন্নতি তাদের ওপর নির্বিচারে চালাতেন দমন, পীড়ন ও অত্যাচার।

সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের বৈষম্য, অন্যায় ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ আর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ফরাসী জনসাধারণ বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সমাজে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁদের আয় বিপুল পরিমাণ হলেও তাঁদের কোন কর দিতে হত না ; অথচ আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও করের যাবতীয় বোঝা চাপানো হত দরিদ্র জনসাধারণের ওপর। এই কর আবার ছিল তিন ধরনের। জমিদারকে খাজনা দিতে হত, গীর্জাকে দিতে হত 'টাইন্থ' বা আয়ের দশমাংশ এবং রাজাকে ভূমিরাজস্ব। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

এ সময়ে ফ্রান্সে চলছিল বুরবোঁ বংশের শাসন। এই বংশের রাজা **চতুর্দশ লুই** ছিলেন যেমন শক্তিশালী, তেমন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হলেও তিনি সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজাদের আমলে ফ্রান্স এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। রাজারা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে দেশের কথা, প্রজাদের কথা ভাববার অবকাশ তাঁদের থাকত না। এমন কী প্রায় পঁচাত্তর বছরের বুরবোঁ বংশের শাসনকালে রাজারা একবারও ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকেন নি। ফলে

এই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং একসময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এ সময়ে ফরাসীদের সামনে ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ। অনেক ফরাসী সৈন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরে এবং দেশের নির্যাতিত ও অবহেলিত জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করে তাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করে।

আরও একটি কারণ ফারসী বিপ্লবে ইন্ধন যোগায়। সেটি হল ফ্রান্সের অর্থসংকট। এই অর্থসংকটের সময় রাজা **পঞ্চদশ লুই**-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজা **ষোড়শ লুই** সিংহাসনে বসেন। কিন্তু পিতার মত ইনিও ছিলেন যেমন শক্তিহীন, তেমনি অযোগ্য। একেই রাজকোষে অর্থাভাব, তার ওপর রাজদরবারের আড়ম্বর ও বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাজা শেষ পর্যন্ত ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে **স্টেট্স জেনারেল** নামে ফ্রান্সের **প্রতিনিধি সভার** অধিবেশন ডাকেন। এটি ছিল ফ্রান্সের সর্বশ্রেণীর মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সভা।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে **ভার্সাই**-এর রাজপ্রাসাদে প্রতিনিধি সভার অধিবেশন বসে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক সংকট মোচনের জন্য এই সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে নতুন কিছু করপ্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। কিন্তু সভার সদস্যগণ তাঁদের বিভিন্ন ক্ষোভ, বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। রাজার ভীতি প্রদর্শনেও কোনো ফল হল না দেখে তিনি সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেন। কিন্তু এতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রতিনিধি সভার সদস্যরা নিকটবর্তী এক **টেনিস কোর্টে** সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে দেশের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তাঁরা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যাবেন এবং যতদিন পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র রচিত না হয় ততদিন কেউ ভার্সাই ছেড়ে যাবেন না। ইতিহাসে এই প্রয়াস **টেনিস কোর্ট শপথ** নামে পরিচিত।

সদস্যরা যখন টেনিস কোর্টে দেশের নতুন সংবিধান রচনায় ব্যস্ত সে সময় একদিন ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারিসের হাজার হাজার ক্রুদ্ধ জনতা শহরে হিংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করে দেন। এরা পরে শহরের মাঝখানে অবস্থিত **বাস্তিল** দুর্গ আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করে। এই বাস্তিল দুর্গ ছিল রাজার যাবতীয় অন্যায় ও অত্যাচারের

কেন্দ্রস্থল। এখানে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানুষকে সারাজীবন বন্দী করে রাখা হত। এই দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র তথা স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান সূচিত হল।

প্রতিনিধি সভার সদস্যদের দাবী অনুযায়ী **রাজা ষোড়শ লুই 'স্টেটস্ জেনারেল'কে জাতীয় পরিষদ** হিসাবে স্বীকার করে নেন। নতুন সংবিধানে সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল বলে ঘোষিত হল। সেই সঙ্গে পরিষদ **"মানবাধিকারের ঘোষণা"** নামে ঘোষণাপত্র রচনা করেন। এই ঘোষণায় বলা হল, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সকল মানুষ এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। এভাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, যা হল ফরাসী বিপ্লবের মর্মবাণী, তা এই ঘোষণাপত্রে ঘোষিত হল। এক কথায়, নতুন প্রণীত সংবিধানে রাজাকে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে স্বীকার করে নেওয়া হল ; কিন্তু আসল কর্তৃত্ব রইল জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।

জাতীয় পরিষদের এই সর্বময় কর্তৃত্ব রাজা ষোড়শ লুই-এর কাছে অসহ্য মনে হয়। রাজার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তিনি সপরিবারে ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়েন। তাঁদের বন্দী করে প্যারিসে আনা হয়। ফরাসী জনগণের মনে এরকম একটা সন্দেহ আগে থেকেই ছিল যে ক্ষমতাচ্যুত রাজা কোনো বিদেশী শক্তির সাহায্যে নিজেতা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন। রাজার পলায়নে তাঁদের সন্দেহ আরও গভীর হয়। এরপর ১৭৯২ খৃস্টাব্দে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সহায়তায় ফ্রান্স আক্রমণ করলে রাজার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়।

এই সময় ফ্রান্সে **'জ্যাকোবিন'** নামে একদল চরমপন্থীর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। তারা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এদিকে বিপ্লবীদের সামনে আর এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশে আসতে পারে এই ভয়ে ইউরোপের রাজারা ফরাসী বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর হন। হল্যাণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া একযোগে বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। ১৭৯২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফরাসী বিপ্লবীদের মনে সন্দেহ হয় যে রাজা তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর শ্যালক অস্ট্রিয়ার রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তাই বিপ্লবীরা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনেন। **ন্যাশন্যাল কনভেনশন** নামে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে তাঁরা একটি সংশোধিত সংবিধান রচনার মাধ্যমে দেশ থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করেন।

জনগণের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে রাজা ও রাণীর শিরশ্ছেদ করা হয় (জানুয়ারী, ২১, ১৭৯৩ খৃঃ)।

রাজার মৃত্যুর পর ফ্রান্সে শুরু হয় চরমপন্থী কার্যকলাপ। চরমপন্থীদের নেতা **রোবস্পীয়র** দেশে **বিভীষিকার রাজত্ব** (Reign of Terror) প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্লব বিরোধী সন্দেহে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানুষের শিরশ্ছেদ করা হয়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক রোবস্পীয়র নিজেও জনরোষ থেকে রেহাই পান নি। তাঁর অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে পদচ্যুত ও তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। এই সঙ্গে ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্বের অবসান হয়।

এরপর ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে মধ্যপন্থীদের চেষ্টায় আর একটি নতুন সংবিধান চালু হয়। এই সংবিধান **'ডাইরেক্টরী'** (Directory) নামে পরিচিত। কিন্তু এই নতুন শাসনব্যবস্থাও ফারসী জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ফলে নতুন মধ্যপন্থী সরকারও জনগণের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সময় অনেক দেশ জোটবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হলে ফ্রান্স আবার গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। এই সংকটকালে যিনি ফ্রান্সের হাল ধরেছিলেন তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টঃ ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপে **নেপোলিয়ন** জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় শক্তিজোট ফ্রান্স আক্রমণ করলে তিনি তাদের পরাজিত করেন। এরপর ইতালির বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ এবং মিশর অভিযান শেষ করে তিনি দেশে ফেরেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ডাইরেক্টরী শাসন জনসাধারণের বেশ অপ্রিয় হয়ে উঠলে নেপোলিয়ন ডাইরেক্টরী শাসনের অবশান ঘটিয়ে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর **কনসালরূপে** দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন শাসনব্যবস্থা **কনস্যুলেট** (Consulate) নামে পরিচিত।


নেপোলিয়ন

কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি কতকগুলি সংস্কারের কাজে হাত দেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি অনেক বিদ্যালয় ও সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ-এর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করে তিনি ফ্রান্সে

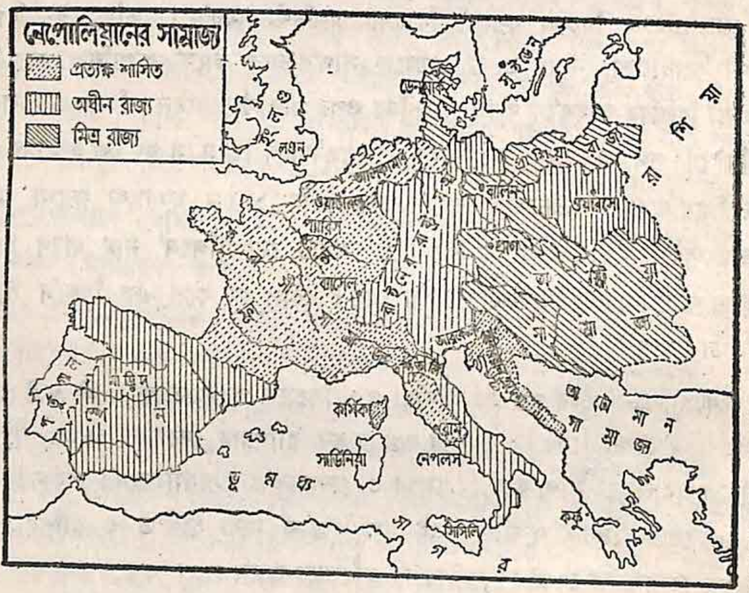
ক্যাথলিক চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। দেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তিনি এক শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি **'ব্যাংক অফ ফ্রান্স'**-এর প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রানীতির সংস্কার করে দেশের অর্থনীতিকে পুনরায় সজীব করে তোলেন। দেশের রাস্তাঘাটের সংস্কার, সেতুর উন্নতিসাধন, খাল খনন, সমুদ্র বন্দরের উন্নতি সাধন করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটান। কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উন্নতির ওপরও তিনি জোর দেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি 'নেপোলিয়ন সংহিতা' (**Napoleon Code**)। ফ্রান্সের আইন-কানুনগুলিকে বিধিবদ্ধ করে নেপোলিয়ন এই সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সংহিতায় আইনের চোখে সকলেই সমান এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর এই বিপ্লবের বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে সার্থকভাবে কার্যে রূপায়িত করে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কনসালরূপে তিনি যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি সে পথ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। উচ্চাশার বশবর্তী হয়ে তিনি ১৮০৪ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে **'সম্রাট নেপোলিয়ন'** নাম ধারণ করেন। এরপর শুরু হর তাঁর দিগ্বিজয়, উদ্দেশ্য সমগ্র ইউরোপ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

নেপোলিয়ন একের পর এক অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে পরাজিত করে ঐ দুই দেশের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তারপর অগ্রসর হন রাশিয়ার দিকে। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে রাশিয়া পরাস্ত হয়ে সন্ধি করে। স্পেন ও ডেনমার্কও নেপোলিয়নের পদানত হয়। ১৮০৫ থেকে ১৮০৮ খৃস্টাব্দ—এই চার বছরের মধ্যে ইংলণ্ড ও রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশই নেপোলিয়নের অধিকারে আসে।

ইংলণ্ড বরাবরই নেপোলিয়নের শত্রু ছিল। নৌযুদ্ধে নেপোলিয়ন একবার ইংলণ্ডের কাছে পরাজিতও হয়েছিলেন। সম্রাট হবার পরও ইংলণ্ড জয় করা তাঁর পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। সুতরাং তিনি ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে ঘা দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। এতে ফল হল বিপরীত। স্পেন ও পর্তুগাল-এর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এই দুই দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অনেকদিন যুদ্ধ চলার পর নেপোলিয়ন পরাজিত হন। সম্রাট হিসাবে এটাই তাঁর

প্রথম পরাজয়। এরপর ১৮১২ খৃস্টাব্দে তিনি সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রাথমিক কিছ্‌ সাফল্যের পর প্রচণ্ড শীত, খাদ্যাভাব এবং রাশিয়ার প্রবল প্রতিরোধের ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয় বাহিনী পরাজিত হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ মিলিত হয়ে নেপোলিয়নের বির্‌দ্ধে র্‌খে দাঁড়ায়। অনেক য্‌দ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ খ্‌স্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে। পরাজিত সম্রাট এতেও হতোদ্যম না হয়ে ১৮১৫ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের বির্‌দ্ধে য্‌দ্ধ জয়ের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু 'ওয়াটারল্‌'র রণাঙ্গনে তিনি ইংরাজ বাহিনীর নিকট চ্‌ড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁকে বন্দী করে **সেণ্ট হেলেনা** দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। সেথানেই ১৮২১ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।



ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের এক স্মরণীর ঘটনা। এর ফলে দেশের অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় যে বিশেষ স্‌যোগ-স্‌বিধা ভোগ করত তা উঠিয়ে দেওয়া হয়। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে অভিজাত শ্রেণী, যাজক, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সকলেই রাষ্ট্রের প্রজার্‌পে স্বীকৃত হয়। ফরাসী বিপ্লবের বাণী স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব সারা পৃথিবীর জনচিত্তে আলোড়ন তোলে। ফলে দেশে দেশে শ্‌র্‌ হয়ে যায় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র এবং

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিপ্লবের আর এক আদর্শ জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ইতালী ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ফরাসী বিপ্লবের আর এক শুভ ফল। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হল প্রত্যেক জাতিরই তার নিজের শাসনব্যবস্থা থাকবে ; সেই শাসনব্যবস্থায় অংশ নেবে জনগণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জনস্বার্থেই পরিচালিত হবে সেই শাসনব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ কালে বহুদেশে সম্প্রসারিত হয়ে সে সব দেশের মানুষকে প্রভাবিত করে।

অনুশীলনী

১। যুক্তিবাদের যুগ কাকে বলে? অষ্টাদশ শতাব্দীকে কেন বিপ্লবের শতাব্দী বলা হয়?

২। উত্তর আমেরিকায় কীভাবে ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? এই উপনিবেশ সংখ্যায় ক'টি? প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

৩। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৪। কীভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়?

৫। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ কী?

৬। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৭। 'শিল্প বিপ্লব' কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? এর আগেকার ইংলণ্ডের অবস্থা কেমন ছিল? কীভাবে এই বিপ্লবের সূচনা হয়?

৮। ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে বিপ্লব আসে?

৯। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের পরিচয় দাও।

১০। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফল কী হয়েছিল?

১১। ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা কীভাবে দেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল?

১২। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর। কীভাবে এই বিপ্লব শুরু হয়?

১৩। বিপ্লব চলাকালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরন দাও।

১৪। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কীভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হন? তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল?

১৫। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফল কী কী?

১৬। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্বের বিবরণ দাও। (খ) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (গ) শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ইংলণ্ডে শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল? (ঘ) শিল্প বিপ্লবের ফলে কারা সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিল? (ঙ) স্টেটস্ জেনারেল কী? কী উদ্দেশ্যে কে এর অধিবেশন ডাকেন? (চ) ফ্রান্সের জাতীয় সভা যে সংবিধান রচনা করেন, তার মুখ্য বিষয় কি ছিল? (ছ) ফ্রান্সে 'ত্রাসের রাজত্ব' কে কিভাবে শুরু করেছিলেন? তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল? (জ) নেপোলিয়নের সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।

১৭। টীকা লেখ : (ক) রেড ইণ্ডিয়ান; (খ) ফিলাডেলফিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র; (গ) মানবাধিকারের ঘোষণা; (ঘ) নেপোলিয়ন সংহিতা; (ঙ) ওয়াটারলুর যুদ্ধ।

১৮। নীচের আবিষ্কারগুলির পাশে আবিষ্কারকের নামগুলি ঠিকমত সাজিয়ে লেখ।

আবিষ্কার	আবিষ্কারক
ফ্লাইং শাটল্	স্টীভেনশন
ওয়াটার ফ্রেম	হারগ্রীভস
স্পীনিং জেনি	হামফ্রে ডেভি
পাওয়ার লুম	জন কে
স্টীম ইঞ্জিন	আর্করাইট
সেফ্‌টি ল্যাম্প	কার্টরাইট

৯. ইউরোপ—ফরাসী বিপ্লবের পরে

(ক) **জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি :** ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম দুটি ফল হল ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ। ঐ সব দেশে শুরু হয় জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার ছিলেন তাঁরা ছিলেন ঘোরতর বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। উদারনৈতিক আদর্শের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল মনোভাবের অবিরাম সংগ্রাম, এই হল বিপ্লবোত্তর ইউরোপের পরিস্থিতি। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রেরই জয় হয়েছিল।

১৮১৫ খৃস্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কগণ ভিয়েনায় এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক **ভিয়েনা সম্মেলন** নামে পরিচিত। এই বৈঠকে যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ইংলণ্ডের মন্ত্রী ক্যাসেলরা, ফরাসী মন্ত্রী টেলিরাঁ এবং অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ। এঁরা সকলেই চেয়েছিলেন নিজ নিজ স্বার্থ সুরক্ষিত করে ফরাসী বিপ্লবসহ যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে। তাই এঁদের লক্ষ্য হল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এবং সেই বিপ্লবজাত অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ইউরোপীয় দেশগুলিতে আবার স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁরা কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **'ন্যায্য অধিকার'**। এই নীতির অর্থ হল, ফরাসী বিপ্লবের আগে যে যে রাজবংশ যে সব অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন তাঁরা সেই সব অঞ্চলের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন। এই নীতির মুখ্য প্রবক্তা হলেন প্রিন্স মেটারনিখ। এই নীতি অনুযায়ী ধর্ম ভাষা রীতিনীতির দিক থেকে প্রচুর অমিল থাকা সত্ত্বেও বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী বুরবোঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়া, ইতালি ও জার্মানীতে শাসককুল আপন কর্তৃত্ব ফিরে পায়।

এতেও তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। এইসব রাজ্যে নিজেদের অধিকার স্থায়ী করার জন্য তাঁরা কার্যকর ভূমিকা নিলেন। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া,

প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড এই চারটি দেশের মধ্যে **চতুঃশক্তি মৈত্রী** (Quadruple Alliance) চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল যদিও ঐ চারশক্তির মিলিত উদ্যোগে ইউরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আসলে এই সংস্থা ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। মুক্তিকামী মানুষের যে কোনো আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া ছিল এই মৈত্রী চুক্তির উদ্দেশ্য।

সে সময়ে ইউরোপের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিখ। বাস্তবিক পক্ষে, ১৮১৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতিতে তিনি এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন যে ঐ সময়কালকে ইতিহাসে **'মেটারনিখের যুগ'** বলা হয়। মেটারনিখ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানুষ নিয়ে গঠিত অস্ট্রিয়ায় একবার যদি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল হয়ে উঠে তাহলে আর এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। আবার ইউরোপের অন্য কোনো রাজ্যে যদি বিপ্লবের প্রসার হয় তাহলেও তার প্রভাব অস্ট্রিয়ার রাজনীতিতে এসে পড়তে পারে। তাই তিনি নানা দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু অস্ট্রিয়া নয় সমগ্র ইউরোপ থেকে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ইউরোপকে ফরাসী বিপ্লবের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্ত প্রকার জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দমন করে নিজের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করাই ছিল মেটারনিখের এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাঁর এই প্রণালী **মেটারনিখ** পদ্ধতি নামে পরিচিত।

কিন্তু কী চতুঃশক্তি মৈত্রী কী মেটারনিখ পদ্ধতি কোনোটিই জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। ইউরোপের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত প্রথমটি জয়যুক্ত হয়।

(খ) **ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের জয়ঃ** ভিয়েনা সম্মেলনে এবং তার পরবর্তীকালে যে সব নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইউরোপের জাগ্রত জনমতকে দাবিয়ে রাখা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। দমননীতি উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদী উদারপন্থীরা গোপনে

ইউরোপের সর্বত্র তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতি এবং চিন্তাধারা ক্রমশই ইউরোপের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে। ফলে গণচেতনার উত্তরোত্তর প্রসার ঘটতে থাকে। এই গণচেতনার দুটি ধারা। এক, উদারনৈতিক বা গণতান্ত্রিক চেতনা, যার লক্ষ্য এমন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে জনগণ অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে। দুই, জাতীয়তাবাদ, যার দ্বারা জার্মান, ইতালীয় জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। ক্রমে উদারনৈতিক শক্তির সংগে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের দাবী সোচ্চার হয়। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ইতালি, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে। নানা দেশের মুক্তিকামী জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি এই আন্দোলনের দ্বারা আবর্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে ইতালি ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

ইতালির ঐক্য আন্দোলনঃ ইতালির রেনেসাঁসের জন্মভূমি হলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটা দেশ রূপে পরিচিত ছিল না। ইতালি নামে একটা ভৌগোলিক অঞ্চল কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে ইতালিকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। তিনি ইতালির পোপ অধিকৃত অঞ্চল নিজের শাসনাধীনে এনে উত্তর দক্ষিণ ইতালি থেকে যথাক্রমে, অস্ট্রিয়া ও স্পেনীয় রাজবংশের শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে এই সব ছোট ছোট রাজ্যকে একই শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। এই সব অধিকৃত অঞ্চলে তিনি একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা ও আইনকানুন প্রচলন করেন। এ ছাড়াও তিনি ইতালিতে নানাবিধ সংস্কার সাধন করে ইতালীয়দের মধ্যেকার বিভেদ দূর করে এক জাতীয় সংহতি স্থাপন করেন। এইসব কারণের ফলে ইতালির মানুষ বুঝতে পারে, পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে তারা কী অভাবনীয় উন্নতি করতে পারে।

কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 'ন্যায্য অধিকার' নীতি অনুযায়ী ইতালীকে আবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়। বিপ্লবের পূর্বেকার অবস্থায় ইতালির যে অংশ যে রাজার শাসনাধীনে ছিল সেই রাজা তাঁর অধিকার ফিরে পান।

অস্ট্রিয়া ইতালির উত্তরে এবং ফ্রান্স দক্ষিণ অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু ইতালীয়দের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে বেশীদিন দমিয়ে রাখা ইউরোপীয় শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। খুব শীঘ্রই ইতালির জনগণ স্বৈরাচারী পরশাসন মেনে নিতে অস্বীকার করে গণতন্ত্র, ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন।

সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি-সামর্থ্য প্রথম প্রথম ইতালীয়দের ছিল না। তাই প্রথম প্রথম জাতীয় আন্দোলন সন্ত্রাসের পথ ধরে এগিয়ে চলে। ইতালীতে কার্বোনারি নামে এক গুপ্ত সমিতি এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু করেন। 'কার্বোনারি' শব্দের অর্থ কাঠকয়লা পুড়িয়ে অর্থাৎ কার্বোনারিদের ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী কাঠকয়লা পোড়াতে হত বলে তাদের ঐরূপ নামকরণ হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কার্বোনারিরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ইতালির ঐক্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাঁরা সে দেশের ঐক্য প্রয়াসকে জয়যুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন ইতালির তিন খ্যাতনামা বিপ্লবী **ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবল্ডী।**

জোসেফ ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালির একজন সফলকাম জননায়ক। ইতালি থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইতালিকে এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি **'তরুণ ইতালি'** (**Young Italy**) নামে এক জাতীয় দল গঠন করে এই দলের সদস্যদের বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। ম্যাৎসিনীর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ইতালি থেকে অস্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির কাছে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। 'তরুণ ইতালি'র আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ম্যাৎসিনীর চেষ্টা বিফলে যায় নি। তিনি ইতালিবাসীর অন্তরে যে স্বাধীনতা ও ঐক্যের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা অনেককাল তাদের মনে সাহস ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে।



ম্যাৎসিনী

ম্যাৎসিনীর পর ইতালির ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন **কাউণ্ট ক্যামিলো কাভুর** নামে এক সুনিপুণ কুটনীতিবিদ্। কাভুর ছিলেন পীয়েডমণ্ট সার্ডিনিয়া রাজ্যের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের একজন মন্ত্রী। তিনি চেয়েছিলেন সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে ইতালির জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনতে। কিন্তু তিনি জানতেন ইতালির ঐক্য সাধনের প্রধান অন্তরায় হল অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়াকে ইতালি থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সাহায্য লাভে মনোযোগ দেন। তিনি কৌশলে



ক্যামিলো কাভুর

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স-এর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী



সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন।

১৮৫৯ খৃস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্ডিনিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় সার্ডিনিয়ার সৈন্যবাহিনী অনায়াসে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লোম্বার্ডি ও মিলান অধিকার করে নেয়। পরে একে একে টাস্কানী, পার্মা ও মোডেনা প্রভৃতি পোপ-শাসিত ইতালীয় রাজ্য পীয়েডমণ্ট সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে ইতালির ঐক্য আন্দোলন অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়।


গ্যারিবল্ডী

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইতালির সিসিলি ও নেপল্স-এ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক গণঅভ্যুত্থান ঘটলে সেই সুযোগে গ্যারিবল্ডী নামে এক বীর সৈনিক এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে অনায়াসেই দুটি রাজ্য জয় করে নেন। সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য দুটিকে পীয়েডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। সব শেষে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সেই সুযোগে ভেনিসিয়া এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের সুবাদে ইতালির সৈন্যবাহিনী **রোম** দখল করে নেয়। এই সঙ্গে ইতালির জাতীয় ঐক্য সম্পন্ন হয়। ইতালি এক স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ঐক্য আন্দোলন—জার্মানীতে ঃ ইতালির মত জার্মানীও ফরাসী বিপ্লবের আগে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তিনশোরও বেশী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করার পর ঐ তিন শতাধিক রাজ্যকে কয়েকটি বড় রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসেন। আবার নেপোলিয়নের আসার সুবাদে জার্মানরা ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই বিপ্লবের আদর্শ জার্মানদের অনুপ্রাণিত করে। জার্মানরাও নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে একটা সুসংগঠিত জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার বাসনা মনে মনে পোষণ করতে থাকেন।

কিন্তু ইতালির মত জার্মানীতেও ১৮১৫ খৃস্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলন জার্মানদের ঐক্য প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই সম্মেলনে গৃহীত 'ন্যায্য অধিকার' নীতি অনুসারে নেপোলিয়নের সময়কার ঊনচল্লিশটি জার্মান রাজ্য নিয়ে এক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করা হয় এবং এই রাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় অস্ট্রিয়ার ওপর। ভিয়েনা

সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত জার্মানদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করলেও জার্মানরা নব জাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশ জুড়ে শুরু হয় জোরদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

ইতালিতে যেমন পীয়েডমণ্ট-সার্ডিনিয়া নামক রাজ্যটি ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, জার্মানীতে তেমনি ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রাশিয়া। এই রাজ্যটিই ছিল জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে **শুল্ক সংঘ** নামে এক সংগঠন তৈরী করা হয় এবং জার্মানীর কয়েকটি রাজ্যকে তার সদস্য করে নেওয়া হয়। এই শুল্ক সংঘ **"জোলভারেন"** নামে পরিচিত ছিল। এই সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অবাধ-বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির মূল কথা হল, এক রাজ্য বিনা শুল্কে অপর রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে। এই বাণিজ্য চালিয়ে একদিকে যেমন সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, অন্যদিকে তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মান কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ জার্মান জনগণের মধ্যে ঐক্য চেতনা ও দেশাত্মবোধের সঞ্চার করেন। এঁদের মধ্যে ফিক্‌টে, হেগেল ও স্টেইন-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় একসময় জার্মানরা বিদ্রোহ করে বসে; কিন্তু মেটারনিখ সে বিদ্রোহ সহজে দমন করেন। এরপর জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে এক সভায় মিলিত হয়ে প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে এক ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সভা **'ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট'** নামে খ্যাত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাশিয়ার একক নেতৃত্বেই জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয় এবং সেই ঐক্য প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী **অটো ফন বিসমার্ক**।

বিসমার্কের জন্ম জার্মানীর ব্রাণ্ডেনবার্গের এক অভিজাত পরিবারে। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। সে সময় ইউরোপের রাজনীতিতে তাঁর মতো চতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিবিদ আর কেউ ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই জার্মানীর ঐক্য আসবে। কিন্তু এই ঐক্য আনয়নের পথে প্রধান বাধা অস্ট্রিয়া। তাকে পরাজিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য সামরিক শক্তি ও সুদক্ষ রণকৌশল প্রয়োজন। তাই প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভের সময় থেকেই তিনি প্রাশিয়ার সামরিক বিভাগের নানা সংস্কার করে তাকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলেন।

এরপর ১৮৬৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খৃস্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে তাঁকে তিনটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। প্রথম যুদ্ধটি হয় ডেনমার্কের সঙ্গে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি দুটি ডেনমার্ক অধিকৃত জার্মান প্রদেশ শ্লেসউইগ ও হলস্টেইন অধিকার করেন। এরপর বিসমার্ক কৌশলে অস্ট্রিয়াকে অপর ইউরোপীয় শক্তিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। বিসমার্ক অস্ট্রিয়া অধিকৃত জার্মান অঞ্চল হ্যানোভার, হেস ইত্যাদি প্রাশিয়ার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। কিন্তু এতেও জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হল না। কারণ তখনও দক্ষিণ জার্মানী ছিল ফরাসীদের অধিকারে।



১৮৭০ খৃস্টাব্দে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ **সেডানের যুদ্ধ** নামে পরিচিত। বিসমার্কের নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত ঐক্যবদ্ধ জার্মান সেনাদল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের বাহিনীকে সহজেই পরাজিত করে দক্ষিণ জার্মানীকে ফরাসী প্রভাবমুক্ত করেন। এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন সফল হয় এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম

উইলিয়মকে জার্মানীর সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। বিসমার্ক হন এই নতুন সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলার।

(গ) **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ :** উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালিতে যখন ঐক্য আন্দোলন চলছিল সে সময় ক্রীতদাস প্রথাকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় সংকট ঘনীভূত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই মহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই মহাদেশের উত্তরাঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় শিল্পের কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিগ্রো দাস শ্রমিক অপেক্ষা দক্ষ ইউরোপীয় শ্রমিকদেরই নিয়োগ করা হত। এই কারণে এই অঞ্চলে ক্রীতদাসদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তরাঞ্চলে এই প্রথার সম্পূর্ণ অবসান হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য নিগ্রো ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হত। এই ক্রীতদাসরা ছিল খুবই দক্ষ। তাছাড়া তাদের দিয়ে চাষবাস করানোর খরচও ছিল সামান্য। বিশেষ করে ক্রীতদাসদের দিয়ে আখ, তামাক, তুলো প্রভৃতির চাষ করে এবং তা বিদেশের বাজারে বিক্রী করে মালিকরা প্রচুর মুনাফা লুটত। ফলে আমেরিকার কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা জাঁকিয়ে বসে। এভাবে ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী উত্তর আমেরিকা এবং এই প্রথা সমর্থনকারী দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়।

যেহেতু উত্তরাঞ্চলের শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতিতে ক্রীতদাসদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, সেহেতু এই অঞ্চলের লোকেরা চাইত এই ঘৃণ্য প্রথা দেশ থেকে উঠে যাক। বাস্তবিকপক্ষে, সে সময় আমেরিকার ক্রীতদাসদের অমানুষিক নির্যাতন ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। ক্রীতদাসদের আঘাত করলে বা দৈহিক শাস্তি দিলে দেশের প্রচলিত আইনে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত না। এক কথায়, ক্রীতদাসরা ছিল যেন মালিকের অস্থাবর সম্পত্তির মত। জোরজুলুম, আঘাত অত্যাচার সবই তাদের নীরবে সইতে হত। এছাড়া দাস ব্যবসা ছিল তখনকার দিনের লাভজনক ব্যবসা। প্রচুর অর্থের লোভে ইউরোপের দাসব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে এনে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করত। উত্তর আমেরিকার লোকদের কাছে এই নিষ্ঠুর প্রথা ক্রমেই অসহ্য বলে মনে হয়। অপরপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার লোকদের কাছে ক্রীতদাস প্রথা লাভজনক হওয়ায় তারা এই প্রথার উগ্র সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

উত্তর-দক্ষিণের এই বিরোধ আরও প্রবল হয়ে ওঠে উনিশ শতকে, যখন আমেরিকার সীমানা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উত্তরের রাজ্যগুলি দাবী জানায় এই নূতন অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা চালু করা চলবে না। কিন্তু দক্ষিণের রাজ্যগুলি এই দাবীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে।

রাজনৈতিক কারণেও উত্তর দক্ষিণের মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠে। জনবহুল উত্তরাঞ্চল সবসময় জনবিরল দক্ষিণাঞ্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল। এতে দক্ষিণাঞ্চলের লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, উত্তরের কর্তৃত্ব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এইসব নানাবিধ কারণে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মতভেদ ও বিরোধ যখন তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে তখন একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'টম কাকার কুটির' (Uncle Tom's Cabin)। লেখক হলেন হ্যারিয়েট বীচার স্টো। দাস শ্রমিকদের ওপর মালিকের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী বইটির মূল বিষয়। এই বই আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশ থেকে এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁরা কৃতসংকল্প হন।

এই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দেন তাঁর নাম আব্রাহাম লিঙ্কন। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশে তাঁর জন্ম। দরিদ্র পরিবারের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করায় ছোটবেলা থেকেই তিনি দারিদ্রের জ্বালা বুঝতেন। দাসত্ব প্রথাকে তিনি নিষ্ঠুর বলে মনে করতেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই সময় উত্তর আমেরিকায় 'রিপাবলিকান' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্কন এই দলের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। পরে ১৮৬০ খৃস্টাব্দে এই দলের প্রার্থীরূপে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।



আব্রাহাম লিঙ্কন

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ধারণা হয় নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজই হবে দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথা নির্মূল করা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দক্ষিণের এগারোটি

রাজ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে **জেফারসন ডেভিডের** নেতৃত্বে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। তাদের এই বিচ্ছিন্নতাকামী প্রচেষ্টার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়েছিল। এই সংকটে আব্রাহাম লিংকন অত্যন্ত শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন এবং দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন।

রাষ্ট্রপতি লিংকন দৃপ্ত ভাষায় দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির নেই। তাঁর এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় (১৮৬১ খৃঃ)। চার বছর যুদ্ধ চলার পর দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসংঘ উত্তরাঞ্চলের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় লিংকন এক ঘোষণার দ্বারা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন (১৮৬৩ খৃঃ)। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁদের আমেরিকান স্বাধীন নাগরিকদের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই আততায়ীর গুলিতে লিংকন প্রাণ হারান।

আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন লিংকনের জীবনের এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী এবং মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন (**Government of the people, by the people and for the people**), তা আজও লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকার ঐক্য ও সংহতি রক্ষা পায়। সদ্যোমুক্ত ক্রীতদাসগণ স্বাধীন নাগরিকরূপে গণ্য হয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিলোপ সাধন করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা সম্ভব হল।

ইউরোপের শিল্পায়ন ঃ আমরা আগেই জেনেছি যে, শিল্পবিপ্লব প্রথম শুরু হয় ইংলন্ডে। কিন্তু এই বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নি। দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে। যেহেতু ইংলন্ডের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ ছিল, সেহেতু ইংলন্ডের শিল্পায়নের প্রভাব সর্বপ্রথম গিয়ে পড়ে ইউরোপের ওপর। অবশ্য ইউরোপের সব দেশে শিল্পায়ন একই সময়ে শুরু হয়নি। নেপোলিয়নের আগে পর্যন্ত ইংলন্ডের শিল্পজাতদ্রব্যের ওপর নির্ভর করে ইউরোপকে চলতে হয়। তখন ইউরোপের বাজার ছেয়েছিল বিলাতী (**Made in England**) ছাপ মার্কা শিল্প সামগ্রীতে। এগুলি যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি সস্তা এবং সহজলভ্য। কিন্তু ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন যখন

ইউরোপের সবকটি বন্দর অবরোধ করেন তখন ইউরোপের বাজারে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর প্রচণ্ড অভাব দেখা যায়। ইউরোপীয়রা মর্মে মর্মে অনুভব করেন বিদেশী দ্রব্য সামগ্রীর ওপর ভরসা করে বসে থাকার কী বিপদ। তখন থেকেই তাঁরা নিজ নিজ দেশে শিল্প গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইউরোপে ব্যাপক শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রথম শিল্পোদ্যোগ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের আর্করাইটের তৈরী যন্ত্রপাতি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে আমদানী করা হয়। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ কলাকুশলী উইলিয়াম ককরিলের প্রচেষ্টায় বেলজিয়ামে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা নির্মিত হয়। ১৮১২ খৃস্টাব্দে জার্মানীর আলসাস প্রদেশে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সুতোর কল চালানো হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর এই শিল্পায়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

শিল্পায়নের দিক থেকে ফ্রান্স অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। শেষে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ফ্রান্সেও শিল্পোদ্যম দেখা যায়। লোহা ও কয়লার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও ফ্রান্সে লৌহশিল্প গড়ে ওঠে। এছাড়া উন্নতমানের রেশম, পশম ও সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনে ফ্রান্স বেশ এগিয়ে যায়।

জার্মানী যখন বিভক্ত ছিল তখন থেকেই সেখানে শিল্পোদ্যোগের শুরু। সে সময় ইস্পাত শিল্পে জার্মানীর বেশ সুনাম ছিল। ঐক্যবদ্ধ হবার পর জার্মানীর ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সুইডেন স্পেন প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। শিল্পজগতে সবশেষে প্রবেশ করে রাশিয়া। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিদেশী শিল্পপতিরাই প্রথমে রাশিয়ার শিল্পের সূচনা করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়ায় শিল্প স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফলঃ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল, যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভব। এরপর থেকে হাত নয়, যন্ত্রের সাহায্যে সব কিছুর উৎপাদন হতে লাগল। যন্ত্রের সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে মানুষও হয়ে উঠল যান্ত্রিক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে জিনিসপত্রের উৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। সেই সব উৎপাদিত জিনিসপত্রের যেমন গুণগত উৎকর্ষ ছিল তেমনি সেগুলি ছিল দামে সস্তা। ফলে শুধু ধনীদের নয়, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে শহরগুলি শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রুজি রোজগারের আশায় মানুষ দলে দলে শহরে এসে ভীড় জমাতে শুরু করল। কলকারখানায় মজুর খেটে নগদ অর্থ উপার্জন করাই হল তাদের লক্ষ্য। ফলে একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হল, অন্যদিকে শহরগুলি হয়ে উঠল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। রেলপথের প্রবর্তন জলপথে স্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত ও পণ্য চলাচল সহজসাধ্য হয়।

শিল্প উৎপাদনের জন্য চাই কাঁচামাল। আবার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাই বাজার। ফলে কাঁচামাল আমদানী ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীর জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। এমনি করে শুরু হয় ঔপনিবেশিক সংগ্রাম।

শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞাও বদলে গেল। আগে অর্থনীতির ভিত্তি ছিল মানুষের শ্রম। নতুন অর্থনীতির ভিত্তি হল যান্ত্রিক কলাকৌশল।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল, যথা—শিল্পপতি বা কলকারখানার মালিক এবং শ্রমিক। সামান্য মজুরীর আশায় ভূমিহীন চাষী কিংবা বেকার মানুষের দল শহরের শিল্পাঞ্চলগুলিতে এসে ভীড় করত। তাদের এই বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যথাসম্ভব কম মজুরীতে কাজে নিয়োগ করে মালিকপক্ষ যতক্ষণ খুশী তাদের খাটিয়ে নিত। শ্রমিকরা ছাঁটাই বা শাস্তির ভয়ে মালিকের সব জোরজুলুম মুখ বুজে সহ্য করত। তাদের যে বাসস্থান দেওয়া হত তা যেমন নোংরা তেমনি অস্বাস্থ্যকর। এতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটত। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, মালিক পক্ষের লক্ষ্য ছিল কম মজুরীতে শ্রমিকদের যতক্ষণ খুশী খাটিয়ে নিজেদের লাভের অংশকে স্ফীত করা। বিনিময়ে শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর তাঁরা দিতেন না বা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করতেন না।

খেটে খাওয়া মানুষ: মার্কস ও এঙ্গেলস্: মেহনতি মানুষের ওপর মালিকপক্ষের এই জুলুম বহুদিন অব্যাহত থাকে। অনেক সময় মালিকপক্ষ কলকারখানায় নারী ও শিশু কর্মীদেরও নিয়োগ করতেন। কারণ এরা মেসিন চালাতে পারত, বিনিময়ে এদের যৎসামান্য মজুরী দিলেই চলত। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে লাগল। কলকারখানায় কাজের অবসরে তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও মালিকপক্ষেব নানা বঞ্চনা নিয়ে আলোচনা করত।

ক্রমশঃ তারা উপলব্ধি করল মালিকপক্ষের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য দরকার তাদের নিজস্ব সংগঠন। শ্রমিকশ্রেণীর এই চিন্তাধারা থেকেই 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলনের উৎপত্তি হল।



কার্ল মার্কস



এঙ্গেল্‌স

শ্রমিক শ্রেণীর এই দুঃখদুর্দশা মানবতাবাদী চিন্তানায়কদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁদেরই চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক কল্যাণের জন্য কিছু কিছু বিধি রচিত হয়। কলকারখানায় শিশু নিয়োগ বন্ধ হয় এবং নারীকর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁরা যে মতবাদ প্রচার করেন তাই সাধারণভাবে 'সমাজতন্ত্র' নামে পরিচিত।

এই সমাজতন্ত্রবাদকে যিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করেন তিনি হলেন **কার্ল মার্কস**। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে জার্মানীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ফ্রান্সে আসেন এবং সেখানে এঙ্গেলস্‌ নামে জার্মানীর আর এক খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রবাদীর সাহচর্য লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সেও তাঁর ঠাঁই না হওয়ায় ব্রাসেল্‌স্‌-এ আসেন। এখানেই তিনি এঙ্গেলস্‌-এর সহায়তায় তাঁর বিখ্যাত ইস্তাহার **'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'** প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে তাঁরা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মার্কস-এর শেষ জীবন কাটে ইংলণ্ডে। সেখানেই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'দাস ক্যাপিটাল'** (Das Kapital বা The Capital)। এই গ্রন্থে মার্কস তাঁর সাম্যবাদের তত্ত্বকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কস-এর মতে সমাজে

দুটি শ্রেণী—একটি পুঁজিপতি বা শোষক শ্রেণী, অপরটি শ্রমিক অর্থাৎ শোষিত শ্রেণী। ফলে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বন্দ্বে তিনি শোষিত শ্রেণী যথা শ্রমিক ও মজুরদের প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করে ক্ষমতা দখল করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতবাদের আর এক বক্তব্য হল, শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফলেই মালিকদের হাতে অর্থ-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। সুতরাং শ্রমের মাপকাঠি দিয়েই শ্রমিক মালিকের মধ্যে অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত। মার্কস ও এঙ্গেলস্ একযোগে যে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করে গেছেন তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, আর সর্বশ্রেণীর মেহনতি মানুষের অধিকারকে করেছে সুরক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

অনুশীলনী

১। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে উদারনৈতিক শক্তির সঙ্গে রক্ষণশীল শক্তির যে সংগ্রাম চলেছিল তার পরিচয় দাও।

২। কী উপলক্ষে ভিয়েনা সম্মেলন বসে? এতে কী কী নীতি গৃহীত হয়েছিল?

৩। 'মেটারনিখ পদ্ধতি' কাকে বলে? এই পদ্ধতি প্রয়োগে মেটারনিখ কী শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন?

৪। ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। বিসমার্ক কীভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, লেখ।

৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

৭। আমেরিকার ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় এবং ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধনে লিঙ্কনের ভূমিকা নির্ণয় কর।

৮। কী পরিস্থিতিতে ইউরোপে শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়? ইউরোপে শিল্প প্রসারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর।

১০। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন?

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ: (ক) ভিয়েনা সম্মেলন, (খ) কার্বোনারি, (গ) ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট, (ঘ) টম কাকার কুটির, (ঙ) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, (চ) দাস ক্যাপিটাল।

১২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) 'উদার নীতি' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি'—কথা দুটির অর্থ কী? (খ) 'ন্যায্য অধিকার নীতি' কী, বুঝিয়ে বল। (গ) 'চতুঃশক্তি মৈত্রী' চুক্তির উদ্দেশ্য কী ছিল? (ঘ) 'মেটারনিখ' পদ্ধতি কাকে বলে? (ঙ) 'তরুণ ইতালি আন্দোলন' কে কীভাবে পরিচালনা করেন? (চ) ম্যাৎসিনী ও কাভুরের কর্মপন্থার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? (ছ) জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে 'শুল্ক সংঘের' ভূমিকা কী ছিল? এই সংস্থাকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়? (জ) 'সেডানের যুদ্ধ' কার মধ্যে হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? (ঝ) কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়? (ঞ) 'সমাজতন্ত্রবাদ' বলতে কী বোঝ?

১৩। নিম্নোক্ত মনীষীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

(ক) মেটারনিখ, (খ) ম্যাৎসিনী, (গ) কাভুর, (ঘ) গ্যারিবল্ডী, (ঙ) বিসমার্ক এবং (চ) আব্রাহাম লিঙ্কন।

১৪। নীচের তথ্যগুলি ঠিক না ভুল টিক (✓) চিহ্ন অথবা কাটা (×) চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ কর। (ক) ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত নেতারা গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। [ ]

(খ) আমেরিকার উত্তরাঞ্চল দাস প্রথার উগ্র সমর্থক ছিলেন। [ ]

(গ) ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ায় সবার আগে শিল্পোদ্যোগ শুরু হয়। [ ]

(ঘ) মার্কস ও এঙ্গেলস্ উভয়েই জাতিতে জার্মান ছিলেন। [ ]

● ১০. চীন ও জাপান

(ক) ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনাপ্রবাহ ঃ প্রচীন সভ্যতার লীলাভূমি চীন উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পঞ্চদশ শতকে জলপথ আবিষ্কারের ফলে চীনের দরজা পাশ্চাত্ত্যের নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়। পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকরা এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। তাদের দেখাদেখি উনিশ শতকের মাঝামাছি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চীনে এসে উপস্থিত হয়। এদের সকলেরই লক্ষ্য এক, চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো। প্রথম প্রথম অবশ্য ইউরোপীয় বণিকরা চীনে তেমন সুবিধা করতে পারে নি। নানা বাধা নিষেধের মধ্যেই তাদের চীন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে হত। চীনের রাজারাও বিদেশী বণিকদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। পরন্তু চীনে ইউরোপীয় পণ্যসামগ্রীর বিশেষ কোনো চাহিদাও ছিল না।

(১) অহিফেন যুদ্ধ ও নানকিং-এর সন্ধি ঃ এসব কারণে ইউরোপীয় বণিকগণ বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকরা চীন সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। এরই মধ্যে ইংরাজরা ভারত থেকে চীনে আফিং আমদানী করে প্রচুর মুনাফা লুটতেন। চীনাদের মধ্যে আফিং খাওয়ার বদ্‌অভ্যাস এমনভাবে ছাড়িয়ে পড়ে যে, চীনের মাঞ্চু সম্রাট চীনে আফিং আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হন। তখন ইংরাজ বণিকরা চোরা পথে ভারত থেকে আফিং আমদানি শুরু করে। চীন সম্রাট তখন বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ জাহাজে তল্লাসী চালাবার ব্যবস্থা নেন। সম্রাটের আদেশে লিন নামক এক কর্মচারী ক্যান্টন বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজে তল্লাসী চালিয়ে আফিং বোঝাই জাহাজগুলি আটক করে কুড়ি হাজার বাক্স ভর্তি আফিং পুড়িয়ে দেন এবং ভবিষ্যতে চীনে আর যাতে আফিং আমদানী না হয়, তারও ব্যবস্থা করেন। ইংরাজরা এতে উত্তেজিত হয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। চীন সম্রাট তাঁদের ঐ দাবী অগ্রাহ্য করায় ১৮৪০ খৃস্টাব্দে ইংরাজদের সঙ্গে চীনাদের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ **"অহিফেন যুদ্ধ"** (১৮৪০ খৃঃ) নামে খ্যাত। যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয়ে ইংরাজের সঙ্গে **'নানকিং-এর সন্ধি'** (১৮৪২ খৃঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরাজরা চীনের কাছ থেকে হংকং দ্বীপটি লাভ করেন। দক্ষিণ চীনের পাঁচটি বন্দরও ইংরাজদের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হয়। এই পাঁচটি সন্ধি-বন্দর হল ঃ

ক্যাণ্টন, সাংহাই, অ্যাময়, নিংপো এবং ফুচু। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থও ইংরাজরা চীন সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেন।

'নানকিং-এর সন্ধি'র শর্ত ইংরাজদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁরা চীন সম্রাটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এক বছরের মধ্যে আরও অনেক সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইংরাজদের **অতিরাষ্ট্রিক অধিকার** (extra-territorial right)। এই অধিকারের সারমর্ম হলঃ চীনের আইন চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না।

চীনাদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য বিদেশী শক্তিও চীনে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার কাজে নেমে পড়ে। এই সময়ে চীনে বিদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে এক ফরাসী ধর্মপ্রচারকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে ফরাসীরা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৬ খৃঃ)। ঐ বছরেই এক ব্রিটিশ জাহাজে ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে জাহাজের কর্মচারীদের শাস্তি দিলে ইংরাজরাও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ফরাসী ও ইংরাজের মিলিত বাহিনীর কাছে চীনারা এবারও পরাজিত হন এবং উভয়ের সঙ্গে **টিয়েনসিনের সন্ধি** (১৮৬১ খৃঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনাদের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য আরো এগারোটি বন্দরের সুযোগ পায়। সেই সঙ্গে অন্যান্য বিদেশীদেরও চীনে অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার প্রদান করা হয়।

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ বাধলে চীন জাপানের কাছে পরাজিত হয়। জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ এবং ফরমোজা সহ কয়েকটি দ্বীপের অধিকার চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয়।

এর পরই শুরু হয়ে যায় চীনের মাটিতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ক্ষমতা দখলের লড়াই। একে ইতিহাসে **'চীনা তরমুজ-এর ভাগ বাঁটোয়ারা'** (Cutting up the Chinese Melon) নামে অভিহিত করা হয়। ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানী ও রাশিয়া নানাভাবে চীন সম্রাটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এক একটি অঞ্চল দখলে নিয়ে আসে। ইংলণ্ডের কথা আগেই বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে পঁচিশ বছরের জন্য **ওয়ে-হাই-ওয়ে** এবং হংকং-এর চারপাশের অঞ্চল ইজারা নেয়। ফ্রান্স ইজারা পায় কুয়াং চৌ উপসাগরের। এছাড়া সে চীনে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ আদায় এবং ইন্দোচীন,

আনাম ও টংকিন প্রদেশ দখল করে। কিয়াও-চাও বন্দর এবং সানটুং ও হোয়াংহো উপত্যকার ওপর জার্মানীর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়া লিয়াওটাং ও মাঞ্চুরিয়া লাভ করে। জাপান দখল করল ফু-চু দ্বীপপুঞ্জ। চীনের জলপথগুলির ওপর ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হল। বাণিজ্য শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগও বিদেশীদের করতলগত হয়।

চীনে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেখল চীনদেশের সবটাই প্রায় ইউরোপীয় দেশগুলি গ্রাস করছে, তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব **জন হে** চীন সাম্রাজ্যে **"উন্মুক্ত দ্বার নীতি"** ঘোষণা করেন (১৯০১ খৃঃ)। এক নির্দেশনামায় তিনি পশ্চিমী শক্তিগুলির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দিলেন যে, চীনে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সব জাতিরই সমান অধিকার থাকবে। বাণিজ্য বা বন্দর শুল্ক সবার ক্ষেত্রে একই ধরনের হবে। নিজের নিজের দখলীকৃত অঞ্চল সকলের জন্য খোলা রাখতে হবে এবং চীনের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া আর সবদেশই হে-র প্রস্তাবিত নীতি মেনে নিল। ফলে চীন সাম্রাজ্যের নিশ্চিত ভাঙ্গন বন্ধ হল। তখনকার দুর্দিনে আমেরিকা বন্ধুর মত চীনের পাশে দাঁড়িয়েছিল; সেজন্য পরবর্তী প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে চীন-মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

(২) **চীনের প্রতিক্রিয়া : (১) তাইপিং বিদ্রোহ :** প্রথম থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলির আগ্রাসী মনোভাব চীনারা ভালোভাবে মেনে নেয়নি। বিদেশীরা চীনে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তার ফলে তারা হয়ে উঠেছিল চীনাদের চক্ষুশূল। সময় সময় বিদেশীদের হাতে চীনাদের লাঞ্ছনায় তাদের অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন তাদের রাগ গিয়ে পড়ে নিজেদের দেশের সরকারের প্রতি। চীনারা নিজেদের সবকিছু দুর্ভাগ্য, লাঞ্ছনা ইত্যাদির জন্য দায়ী করে মাঞ্চু শাসকদের; একের পর এক অহিফেন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনাদের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, মাঞ্চু শাসকরা শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। শুধু তাই নয়; নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য তাঁরা চীনকে বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তাই চীনকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হলে এই অপদার্থ শাসককুলের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এক দল চীনা ১৮৫১ খৃস্টাব্দে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ **'তাইপিং বিদ্রোহ'** নামে খ্যাত (১৮৫৩ খৃঃ)।

তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের অধিবাসী হাং-সিউ-চুয়ান। তিনি খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করে খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তারপর প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের অনুকরণে এক ধর্মমত গঠন করে সেই নতুন ধর্মে দেশবাসীকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন।

তাইপিং বিদ্রোহ প্রথম থেকে বিদ্রোহের রূপ নেয় নি। মাঞ্চু সরকার বিদ্রোহীদের দমন করতে উদ্যোগী হলে এই বিদ্রোহ মাঞ্চু রাজবংশ বিরোধী এক রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তাইপিং শব্দের অর্থ হল পরম শান্তি। তাই তাইপিং বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল চীনে যাতে 'পরম শান্তি' বিরাজ করে এমন এক আদর্শ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা।

হাং-এর আদর্শ অচিরেই চীনে জনপ্রিয়তা লাভ করে। অগণিত অনুচর নিয়ে তিনি উত্তর চীনের দিকে অগ্রসর হয়ে নানকিং দখল করে সেখানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজেকে স্বর্গীয় রাজা বলে ঘোষণা করেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তাইপিং বিদ্রোহ ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিদ্রোহীদের হাতে চীনদেশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়। বিদ্রোহীগণ চীনাদের অহিফেন সেবন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে জানিয়েছিলেন তীব্র প্রতিবাদ। যেহেতু বিদ্রোহীরা ছিলেন অধিকাংশই কৃষক, কারিগর, গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, সেহেতু বিদ্রোহের অনেকটাই পরিচালিত হয়েছিল দেশের ধনী কৃষক, বণিক সম্প্রদায় ও বিত্তবান মানুষের বিরুদ্ধে। সেই সময় তাইপিং বিদ্রোহীরা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বিলির যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন তাকে নিঃসন্দেহে সে যুগের এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলে গণ্য করা যায়।

তাইপিং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। বিদেশীদের সহায়তায় মাঞ্চু সরকার এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি চীনের রক্ষণশীল সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিরূপ মনোভাবও বিদ্রোহীদের অসাফল্যের কারণ। ব্যর্থ হলেও মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত বিদ্রোহ হিসাবে এর গুরুত্ব অনেক। এই বিদ্রোহই পরবর্তীকালে মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদ এবং চীনের জনগণের বৃহত্তর আন্দোলনের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

(২) **শতদিবসের সংস্কার :** চীন দেশে বিদেশীদের আধিপত্য এবং চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয় চীনের জনগণের মনে চীন সরকার সম্পর্কে এক বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। চীনের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবতে শুরু করেন যে, মাঞ্চু সরকারের অপদার্থতা এবং চীনের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও কুসংস্কার চীনাদের যাবতীয় লাঞ্ছনা ও দুরবস্থার জন্য দায়ী। তাই চীনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার যদি আমূল সংস্কার না করা যায় তাহলে চীনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সব চিন্তা থেকে চীনে একদল সংস্কারপন্থী মানুষের উদ্ভব হয়। এই দলের নেতা ছিলেন **ক্যাং-ইউ ওয়ে**। তিনি একাধারে চিন্তাবিদ এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। চীন-দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কথা জানিয়ে তিনি চীন সম্রাটের কাছে এক পত্র লেখেন। এই সময় চীন সম্রাট ছিলেন **কোয়াং সু**। চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪ খৃঃ) চীনের পরাজয় হলে তিনিও চীনে আধুনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। এর মধ্যে ক্যাং-ইউ এবং সম্রাট **কোয়াং সু-র** মধ্যে সাক্ষাৎ হলে উভয়ে মিলিতভাবে সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেইমত ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে সম্রাট কতকগুলি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন। একশ দিন ধরে ক্রমাগত এই সংস্কারগুলি ঘোষিত হয়েছিল বলে এগুলিকে **'শত দিবসের সংস্কার'** বলা হয়। এই সংস্কারগুলির অন্যতম হল ঃ শিক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার, বিদেশী বইপত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য এক অনুবাদ বিভাগের প্রতিষ্ঠা, অপ্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগগুলির বিলোপ সাধন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন নতুন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্থাপন, সামরিক ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধন ইত্যাদি।

চীন সম্রাটের এই সংস্কার প্রচেষ্টায় দেশের প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিচলিত হয়ে উঠল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এসবের বিরোধিতায় নেমে পড়েন। তাঁদের এই কাজে সহায় ছিলেন রাজমাতা **জু-সি** স্বয়ং। তিনি সম্রাট পুত্রকে বন্দী করে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তারপর সম্রাট ঘোষিত সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেন। চীনের সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সংস্কার আন্দোলন সফল না হলেও চীনের জনগণ কিন্তু এবারও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন তাঁদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বিদেশীরা। ফলে বিদেশীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। ইতস্ততঃ গড়ে উঠতে থাকে গুপ্ত সমিতি। এইগুলির উদ্দেশ্য হল সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করা।

(৩) **বক্সার বিদ্রোহ ঃ** চীনের এই রকম একটি গুপ্ত সমিতির নাম ছিল 'ই-হো-তুয়ান', বাংলায় যার অর্থ হল 'ন্যায়ের সুসমঞ্জস্য মুষ্টি'। এই সমিতির

উদ্যোগে ১৮৯৯-১৯০০ খৃস্টাব্দে চীনের সর্বত্র যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তাকে ইতিহাসে **'মুষ্টি যোদ্ধার হাঙ্গামা'** বা **'বক্সার বিদ্রোহ'** বলা হয়। এই সমিতির সদস্যরা শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামচর্চা, লাঠিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ কলা-কৌশল শিক্ষা করত। এ থেকেই মুষ্টিযোদ্ধা (Boxer) কথাটির উৎপত্তি। বক্সার বিদ্রোহীদের শ্লোগান ছিল ঃ "বিদেশীদের ধ্বংস করে দেশকে রক্ষা কর।"

অবস্থা বুঝে সম্রাজ্ঞী জু-সিও দেশ থেকে বিদেশীদের বিতাড়নের ব্যাপারে বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিদ্রোহীদের ঐ কাজে প্ররোচিত করেন।

বক্সার বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য যদিও বিদেশী এবং খৃস্টান মিশনারীরা, তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণে দেশেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক বিদেশী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীরা পিকিং ও টিয়েনসিন দখল করে নেয়। প্রায় দেড় মাস যাবৎ বিদ্রোহীদের তাণ্ডবলীলা চলার পর ইউরোপীয় দেশগুলির মিলিত বাহিনী বক্সার বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহ দমনে ইউরোপীয় সেনারা যারপরনাই নৃশংশতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

(৪) **সংস্কারের নতুন প্রচেষ্টা ঃ** বক্সার বিদ্রোহ দমনের পর চীনের প্রাচীনপন্থী এবং বিদেশী বিরোধী উভয় গোষ্ঠীই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। সকলেই বুঝতে পারেন যে, দেশের প্রাচীন কাঠামোকে ভেঙ্গে সব কিছুকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে না পারলে চীনাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের সাফল্য দেখে চীনাদের মনে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। এখন থেকে সংস্কার বিরোধী মাঞ্চু সরকারও সংস্কারের পক্ষে অভিমত দেন। ১৯০৫-০৬ খৃস্টাব্দে চীন সম্রাজ্ঞী চীনে সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। দেশের প্রচলিত আইন ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। সম্রাজ্ঞী দেশের জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। সামরিক বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। চীনাদের অহিফেন সেবা বন্ধ করা এবং চীনের সর্বত্র এই ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়। এইসব সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে চীন সম্রাজ্ঞী মাঞ্চু সরকারের পতন কোনোক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু চীন সাম্রাজ্যের তখন এমনই ভগ্ন দশা যে, এই সব সংস্কার চীনের অবস্থা ফেরানোর পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। প্রজারা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, হীনবল মাঞ্চু রাজাদের পক্ষে আর দেশের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তাই

এবার তাদের লক্ষ্য হল চীনের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) **মাঞ্চু রাজবংশের পতনঃ প্রজাতান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয়ঃ** ১৯০৮ খৃস্টাব্দে চীন সম্রাজ্ঞী জু-সি-র মৃত্যু হলে এক নাবালক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এই নাবালক সম্রাটের পক্ষে সমস্যা জর্জরিত চীনের হাল ধরা সম্ভব ছিল না। এই সময় দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন শহরে **সান-ইয়াৎ-সেন** নামে এক দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা একটি জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এই দলের সদস্যরা চীনের সর্বত্র জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং আধুনিক সংস্কারের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এই প্রচারের ফলে চীনের জনমানসে দেখা যায় এক নবজাগরণ। এতে ভয় পেয়ে ১৯১০ খৃস্টাব্দে চীন সরকার এক জাতীয় পরিষদ গঠন করে তার ওপর সংসদীয় শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেন। কিন্তু চীনা জনগণ মাঞ্চু রাজাদের ওপর এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তাঁরা আর কোনো আপোষে যেতে রাজী হলেন না। ১৯১১ খৃস্টাব্দে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা অনায়াসেই নানকিং শহর দখল করে সেখানে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন হন সেই অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।



সান-ইয়াৎ-সেন

এদিকে মাঞ্চু সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিপ্লবীদের গতি প্রতিহত করার জন্য তাঁরা **ইউয়ান শি-কাই** নামে একজন রণকুশল ব্যক্তিকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁর ওপর বিদ্রোহ দমনের ভার দেন। ফলে চীনে এক গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠে। এর একদিকে সাধারণতন্ত্রী সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীবাহিনী, অন্যদিকে রাজতন্ত্রের সমর্থক ইউয়ান-শি-কাই-এর নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহিনী। শেষ পর্যন্ত দুই নেতা এক সমঝোতায় আসার ফলে চীনে গৃহযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। চীনের নাবালক সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ইউয়ান শি-কাই হন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৯১২ খৃঃ)।

(খ) **জাপানের উত্থান**ঃ চীনের মত জাপানও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তবে চীনের মত পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষে জাপানে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের দেশগুলি জোরপূর্বক জাপানের কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত করে দিলে জাপানীরা সমসাময়িক শাসককুল 'শোগুন'দের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। মধ্যযুগে ইউরোপের মত জাপানে **মিকাডো** বা সম্রাট যদিও ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান তথাপি সাম্রাজ্যের আসল কর্তৃত্ব ছিল এই 'শোগুন' বা সামন্তদের হাতে। তাঁরা দাবী জানাতে থাকেন শোগুনরা দেশ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন; সুতরাং অবিলম্বে তাঁরা সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করুন। এর ফলে জাপানে শোগুন-বিরোধী ও শোগুন-সমর্থকদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। শোগুন বিরোধী শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা বুঝে শোগুনরা স্বেচ্ছায় সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে শোগুন পরিবারের হাত থেকে সম্রাট মুৎসোহিতো মুক্তি পান। তাঁকে আবার সিংহাসনে স্থাপন করে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা **মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা** (Meiji restoration) নামে অভিহিত। 'মেইজি' শব্দের অর্থ 'উন্নত রাজত্ব'। সম্রাট মুৎসোহিতোর শাসনকালে জাপানের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বলে তাঁর রাজত্বকালকে 'মেইজি শাসনের যুগও' বলা হয়।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে মুৎসোহিতো সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রয়োগে দেশের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে দেশকে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে পেঁাছে দিয়েছিলেন।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের জন্য ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে প্রাশিয়ার অনুকরণে জাপানে এক নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বলে ঘোষিত হয়। একই সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় প্রতিনিধিসভার সংস্থান রেখে একে গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়। দেশে সামন্তপ্রথার অবসান ঘটানো হয়। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সামন্ত প্রভুদের জমি রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সম্রাট জাপানের পাশ্চাত্তীকরণের দিকে মনোযোগ দিলেন। জাপানীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন পাশ্চাত্য শক্তিগুলির অপরিমেয় শক্তি-সামর্থের কথা। তাঁদের মনে এই ধরণা বদ্ধমূল হল যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে জাপানকে পুনর্গঠিত করতে পারলে জাপানও একদিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্ররূপে

আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে জাপানীরা সম্রাটের সবরকম সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। জনসাধারণের আনুকূল্যে সম্রাট দেশের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সামরিক ব্যবস্থা সব কিছুর সংস্কার সাধন করে জাপানকে এশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

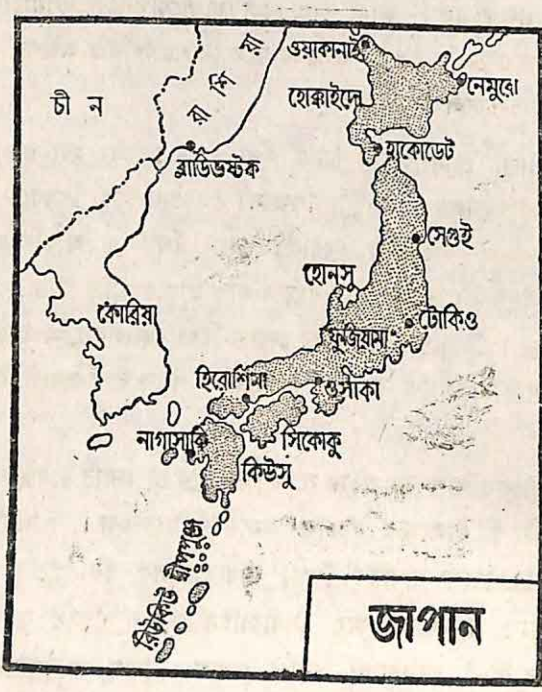
ইউরোপের শিল্পায়ন জাপানকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই জাপানও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পোন্নয়ন ও কৃষিকাজের উন্নতি ঘটিয়েছিল। শিল্পায়নের ফলে জাপানে দ্রুত কলকারখানা গড়ে ওঠে। পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়। ডাক, তার, রেল যোগাযোগ এবং স্টীমারযোগে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। এসবের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং পণ্য চলাচলের সুবিধা হয়।

দেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য গড়ে তোলা হল একাধিক কারিগরি বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষার সর্বস্তরেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়। পাশ্চাত্ত্যের প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থাও করা হয়। বিদেশের শিক্ষকদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়। নারীরা যাতে এক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সেনাবাহিনীকেও পাশ্চাত্ত্য প্রথায় সুশিক্ষিত করে তোলবার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রে জাপান জার্মানী ও ইংলন্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। সামরিক বিভাগকে জাতীয়করণ করে দেশে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। বিদেশ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্র আমদানী করে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করা হয়। দেশে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনকল্পে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানাও স্থাপন করা হয়েছিল।

এভাবেই জাপান দেশের সর্বস্তরে পাশ্চাত্ত্যীকরণের মাধ্যমে নিজেকে এশিয়ার অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে গড়ে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন পাশ্চাত্ত্য রীতি প্রয়োগ করে জাপান আধুনিকতার পথে অগ্রসর হলেও কখনো সে তার জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দেয়নি। জাতীয় ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই জাপান পাশ্চাত্ত্যের ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলেছিল।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ঃ পাশ্চাত্যের সবকিছু আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জাপান পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও গ্রহণ করে। দেশে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে জাপান অচিরেই ইউরোপীয় শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। আবার দ্রুত শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। জাপানের মত একটা ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এই বাড়তি উৎপাদন ও বর্ধিত জনসংখ্যা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন তাও জাপানে ছিল না। এজন্য অন্য দেশের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কাজেই এ সবের জন্য ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ন্যায় জাপানও দেশে



দেশে স্বীয় উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টায় রত হল। এছাড়া শক্তিধর দেশ হিসাবে বিশ্বরাজনীতিতে অংশ গ্রহণের লোভও সে ছাড়তে পারছিল না। এসব কারণেই জাপান ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রথমেই তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে চীনের কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার ওপর। কোরিয়া জাপানের অনতিদূরে অবস্থিত। জাপানের ভয় হল, কোরিয়া যদি ইউরোপীয় শক্তির করতলগত হয় তবে তা হবে জাপানের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই জাপানের

সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু হল কোরিয়াকে নিজের দখলে আনবার। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য চীন সৈন্য পাঠায়। এই অজুহাতে জাপানও তার সেনাবাহিনী পাঠায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে **চীন-জাপান যুদ্ধ** শুরু হয়ে যায় (১৮৯৪ খৃঃ)। এই যুদ্ধ নয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। চীন এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপানের সঙ্গে **শিমনোশেকির সন্ধি** করতে বাধ্য হয় (১৮৯৫ খৃঃ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে জাপান চীনের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং ফরমোজা, লিয়াও-টুঙ এবং আরও কয়েকটি দ্বীপের অধিকার লাভ করে। এছাড়া ইউরোপীয় শক্তিগোষ্ঠী চীনে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল জাপান সে সমস্তও চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। পরন্তু চীন কোরিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

জাপানের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মাঞ্চুরিয়ার দখল নেওয়া। এই স্থানটির ওপর রাশিয়ারও নজর ছিল। তাই রাশিয়া একে দখল করার এক পরিকল্পনা নেয়। রাশিয়ার এই আগ্রাসন নীতিতে ইংলণ্ডও ভয় পেয়ে যায়। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ার ওপর রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইংলণ্ড জাপানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে (১৯০২ খৃঃ) আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ড জাপানকে এক অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসাবে মেনে নেয় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে সৈন্য পাঠালে **রুশ-জাপান যুদ্ধ** (১৯০৪-০৫ খৃঃ) শুরু হয়। জাপানের মত একটি ক্ষুদ্র দেশ বিশাল এবং শক্তিশালী রাশিয়াকে স্থল ও নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। রাশিয়া জাপানের সঙ্গে **পোর্টস-মাউথের** সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে রাশিয়া কোরিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য মেনে নেয় এবং মাঞ্চুরিয়ার দখল ছেড়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এছাড়া বিরাট একটি শক্তিধর জাতিকে পরাজিত করে জাপান বিশ্বরাজনীতিতে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়। এরপর জাপান সামান্য এক অজুহাতে কোরিয়া দখল করে নেয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের সাফল্য তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বাড়িয়ে তোলে—একথা আগেই বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় (১৯১৪ খৃঃ)। ইউরোপের দেশগুলি যখন সেই যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন জাপান চীনে জার্মান অধিকৃত অঞ্চল সানটুং প্রদেশটি দখল করে নেয়। এই সঙ্গে সে চীনদেশের কাছে **'একুশ দফা দাবীপত্র'** পেশ করে। প্রধান প্রধান দাবীগুলি হল সানটুং, মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হবে ; চীনে জাপানকে

কয়লা ও লোহা সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ; জাপানের অনুমতি ব্যতীত চীনের কোনো অঞ্চল, বন্দর বা উপকূলভাগ কোনো রাষ্ট্রকে দেওয়া চলবে না ইত্যাদি। চীনের দুর্বল ইউয়ান-শি-কাই সরকার প্রতিবাদ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়ে জাপানের অধিকাংশ দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন।

অনুশীলনী

১। চীনদেশে ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রাধান্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। প্রথম অহিফেন যুদ্ধের কারণ কী ? কীভাবে এই যুদ্ধের অবসান হয় ?

৩। চীনদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। তাইপিং বিদ্রোহ কেন হয় ? এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের আপাতঃ সাফল্য ও বিদ্রোহের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫। চীনে 'শত দিবসের সংস্কার' এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। 'বক্সার বিদ্রোহ' কী ? এই বিদ্রোহ কীভাবে বিস্তার লাভ করে ? কারা এই বিদ্রোহ দমন করেন ?

৭। চীনে কীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয় ?

৮। জাপানে 'মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা' সম্পর্কে কি জান ? এতে সম্রাটের ক্ষমতা কীভাবে বৃদ্ধি পায় ?

৯। মেইজি শাসনকালে জাপানের উন্নতির পরিচয় দাও।

১০। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

১১। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ কেন হয়েছিল ?

(খ) পাঁচটি সন্ধি-বন্দর কী কী ?

(গ) 'চীনা তরমুজের বাঁটোয়ারা' সম্পর্কে কী জান ?

(ঘ) 'শতদিবসের সংস্কার' কী ?

(ঙ) 'বক্সার বিদ্রোহের' এরূপ নামকরণ কেন করা হয় ?

(চ) জাপ সম্রাট কীভাবে তাঁর ক্ষমতা ফিরে পান ? তাঁর নাম কী ?

(ছ) ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

(জ) রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ কী ?

(ঝ) 'একুশ দফা দাবী' সম্পর্কে কী জান ?

১২। দু-এক কথায় নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) প্রথম অহিফেন যুদ্ধের অবসানে কোন্ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? (খ) চীন-জাপান যুদ্ধ কোন্ বছর অনুষ্ঠিত হয়? (গ) কে কবে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' ঘোষণা করেন? (ঘ) তাইপিং শব্দের অর্থ কী? তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? (ঙ) কে চীন সম্রাট কোয়াং-সু কে অপসারিত করে চীনের ক্ষমতা দখল করেন? (চ) কত সালে চীন প্রজাতান্ত্রিক দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে? প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? (ছ) 'মেইজি' কথাটির অর্থ কি?

১৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা জান লেখ :

(ক) অতিরাষ্ট্রিক অধিকার; (খ) সংস্কারের নূতন প্রচেষ্টা; (গ) সান-ইয়াৎ-সেন; (ঘ) শিমনোশেকির সন্ধি এবং (ঙ) পোর্টস্ মাউথ-এর সন্ধি।

১৪। বন্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক শব্দটি নির্বাচন করে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর।

(ক) তাইপিং শব্দের অর্থ ——। [বিপ্লব/পরম শান্তি]

(খ) বক্সার শব্দের অর্থ ——। [একটি স্থান/বিপ্লবী/মুষ্টিযোদ্ধা]

(গ) জাপানে সামন্ত প্রভুদের বলা হত ——। [শোগুন/মিকাডো/মেইজি]

(ঘ) প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি ——।

[চিয়াং কাই শেক/মাও সে তুং/সান-ইয়াৎ-সেন]

(ঙ) 'মেইজি' কথাটির অর্থ ——। [মধ্যপন্থী/মিকাডো/রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা]

১১. ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনাধীনে ভারত
[১৮৫৮ —১৯১৪]

নতুন শাসনব্যবস্থা ঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৮৫৮ খৃঃ) । তাঁকে পরামর্শ ও নির্দেশ দেবার জন্য ভারতসচিব নামে আরও একটি পদের সৃষ্টি বরা হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কোনো একজন সদস্য ভারত সচিবরূপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ভাইসরয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। ভারত-সচিবকে সাহায্য করতেন একটি উপদেষ্টা পরিষদ। নতুন শাসনব্যবস্থায় কোনো ভারতীয়কেই গ্রহণ করা হয় নি।

মহারাণীর ঘোষণাপত্রে অবশ্য ভারতীয়দের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঃ অতঃপর ইংরাজ সরকার ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করবেন না ; ভারতীয়দের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতি অনুসৃত হবে। দুঃখের বিষয়, এই সব প্রতিশ্রুতির কোনটিই ভবিষ্যতে পালন করা হয় নি। পরবর্তী ভাইসরয়গণ মহারাণীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের কাজে লেগে যান।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঃ এই পর্যায়ে ব্রিটিশের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল ভূটান। ভূটানের সঙ্গে ইংরাজের সীমানা বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জনৈক ইংরাজ দূত ভূটানে যান। কিন্তু তাঁর দৌত্য নিষ্ফল হলে ইংরাজ সেনাদল ভূটান আক্রমণ করে। যুদ্ধে ইংরাজরা ভূটানীদের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে সরকার ভূটানের রাজাকে বাৎসরিক করদানের বিনিময়ে উত্তর বাংলার ডুয়ার্স অঞ্চলটি লাভ করেন।

এরপর আফগানিস্তানে এক গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার সেখানেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরাজদের সদ্ভাব মোটামুটি বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শের আলী আমীর হন। এই সময় আফগানিস্তানের রুশ প্রভাব বিস্তারের ভয়ে বিটিশ সরকার কাবুলে এক ইংরাজ দূতকে রাখার প্রস্তাব করেন। শের আলী সে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ইংরাজ বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৯৭৮-৮১ খৃঃ) নামে পরিচিত। যুদ্ধ চলাকালে শের আলী পলায়ন করেন। তাঁর ছেলে ইয়াকুব ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, ইংরাজরা ইয়াকুবকে আমীর বলে মেনে নেবে এবং বিনিময়ে তারা গ্রহণ করবে আফগানিস্তানের বিদেশ নীতি পরিচালনার ভার। এই সন্ধি স্থায়ী হয় নি। স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানরা এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত অমান্য করে কাবুলের ইংরাজ দূতকে হত্যা করেন। ফলে আবার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হন। ইংরাজগণ শের আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল রহমানকে নতুন আমীর বলে স্বীকার করে পুনরায় সন্ধি স্থাপন করেন।

এরপর একে একে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ ইংরাজদের অধিকারে আসে। আগেই ইংরাজের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের পর পর দুটি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড়লাট লর্ড ডাফরিনের আমলে **তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ** (১৮৮৪-৮৫ খৃঃ) হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রহ্মরাজ **থিবো** আত্মসমর্পণ করেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। বড়লাট হয়েই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ দখল করেন। তারপর কর্নেল ইয়ং হাজব্যান্ড-এর নেতৃত্বে তিব্বতে এক অভিযান পাঠান। ইয়ং হাজব্যান্ড তিব্বত আক্রমণ করে রাজধানী লাসা অধিকার করেন। তিব্বতের শাসনকর্তা দলাইলামার অনুপস্থিতিতে তিব্বতীরা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করেন। শর্ত অনুযায়ী তিব্বত সরকার তিব্বতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ড-এর উপস্থিতি এবং বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের আধিপত্য মেনে নেয়।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ঃ ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় সংস্কারের যুগ। এই সময় ভারতে একাধিক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে এসে তাঁরা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় নানা সংস্কারের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেন। ইংরাজ সরকার প্রথম প্রথম জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে এই সব সংস্কারের কাজকর্মে তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। কিন্তু ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল কয়েকজন বড়লাটের সহায়তায় ভারতীয় সংস্কারকগণ সমাজের নানাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন **রাজা রামমোহন রায়**। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার দূর করা এবং একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি **ব্রাহ্ম সমাজ** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮২৮ খৃঃ)। রামমোহন ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য

কীর্তি সতীদাহ প্রথা নিবারণ। রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী, মানবাত্মার মহত্ত্বে বিশ্বাসী এবং ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে।

ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে মহারাষ্ট্রের **প্রার্থনা সমাজ** নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মদের মত প্রার্থনা সমাজের সদস্যরাও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজ-সংস্কারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এঁদের কর্মসূচী ছিল সমাজে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহের প্রচলন করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, দুঃস্থদের কল্যাণসাধন প্রভৃতি। এই সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন **মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে।**


দয়ানন্দ সরস্বতী

পাঞ্জাবের **আর্য সমাজ** আর একটি প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **দয়ানন্দ সরস্বতী**। তিনি চেয়েছিলেন বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কার করতে। রামমোহনের মত দয়ানন্দও জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রভৃতি সামাজিক কু-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অ-হিন্দুদের হিন্দু-ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন প্রবর্তন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত **রামকৃষ্ণ মিশন** হল আর একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যার প্রভাব অপরিসীম। স্বামীজীর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য নিয়ত কাজ করে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী 'যত মত তত পথ' মানুষকে দিয়েছে এক নতুন পথের সন্ধান। তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ সমাজসেবার এক নতুন পথের সংজ্ঞা রচনা করেছে। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ আজও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়।


শ্রীরামকৃষ্ণ

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও সেকালে সমাজে অনেক সংস্কার সাধিত হয়। এই রকম একজন সংস্কারক হলেন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর অবদান আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম স্মরণীয়। তিনি হলেন **অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের** প্রতিষ্ঠাতা **স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ**। পাশ্চাত্ত্য ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করাই ছিল তাঁর ব্রত।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতীয়গণ 'জাতীয়তাবাদ', 'গণতন্ত্র', 'উদার নীতি' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ভলতেয়ার, রুশো, বার্ক, বেন্থাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের রচনা ভারতীয়দের মনে জাগিয়ে তোলে গভীর দেশপ্রেম। ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদির ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমেই ক্ষোভ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মত বিনিময় সহজ হয় এবং একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকায় ব্রিটিশের নানা জনবিরোধী কার্যকলাপের কথা প্রকাশিত হতে থাকলে ভারতের জনমত ক্রমেই জাগ্রত হয়ে ওঠে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের রচনা ভারতীয়দের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকাবাসীদের সাফল্য, ফরাসী বিপ্লব, ইতালি ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন ভারতবাসীকে পরশাসন মুক্ত হতে প্রেরণা যোগায়। ভারতীয়গণ উপলব্ধি করেন বিদেশী শাসনই তাঁদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। এর জন্য ভারতীয়গণ মাতৃভূমির সর্ববিধ সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এভাবেই ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। দেশের প্রতি জাগে মমত্ববোধ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য একের পর এক শক্তি সংহত হতে থাকে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বাধীনতা ভারতীয়দের কাম্য ছিল না। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের মঙ্গল হোক, এটাই তাঁরা চাইতেন। কিন্তু ভারতীয়দের দাবী দাওয়ার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উপেক্ষা এবং ভারতীয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাব তাঁদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একেবারে আদিপর্বে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। এগুলি হল 'জমিদারদের সমিতি',

(১৮৩৬ খৃঃ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খৃঃ) ব্রিটিশ ভারত সভা (১৮৭৫ খৃঃ), ভারতসভা (১৮৭৬ খৃঃ) প্রভৃতি। এর মধ্যে একমাত্র 'ভারত সভা'ই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ; অবশেষে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। অনেকের মতে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল **অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম** নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর অবদান। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যার মাধ্যমে জনগণ তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারবে এবং সরকারী কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন হিউমের এই প্রস্তাবে সায় দেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। তারপর থেকে প্রতি বছরই এক এক জনের সভাপতিত্বে এক এক জায়গায় কংগ্রেসের এই অধিবেশন বসত। এই সময়কার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁদের শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাই তাঁরা 'আবেদন-নিবেদন নীতি'র মাধ্যমে ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সরকারের ঔদাসীন্য ক্রমে একশ্রেণীর কংগ্রেস কর্মীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এঁরা সরকারের তোষণনীতির পরিবর্তে সরকারী নীতির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। এঁদের বলা হত চরমপন্থী। এই চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল।



অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫—১৯১৪)ঃ ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মোটামুটি মধ্যপন্থী নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তারপর চরমপন্থীরা আস্তে আস্তে দলে ভারী হওয়ায় নেতৃত্ব তাঁদের হাতে চলে যায়। এই সময়ের চরমপন্থী আন্দোলন দুটি ধারায় চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সন্ত্রাসবাদী

আন্দোলনের গুরু ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। আর একদল যাঁরা কংগ্রেসের 'আবেদন-নিবেদনের নীতিতে' বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমে পড়েন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুদলে ভাগ হয়ে যায়। এরপর লাল-বাল-পালের নেতৃত্বে চরমপন্থীগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত জাগ্রত করে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার আদর্শকে জনপ্রিয় করে তুলে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চরমপন্থীদের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

১। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আসে? মহারাণীর ঘোষণাপত্রে কোন্ কোন্ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল? সেই সব প্রতিশ্রুতি কী রক্ষিত হয়েছিল?

২। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

৩। ভারতে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। কী কারণে ভারতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে?

৫। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী দল সম্পর্কে কী জান? কত খ্রীস্টাব্দে কোথায় কংগ্রেস বিভক্ত হয়?

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের কারণ কী? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? (খ) ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে আর কী জান? (গ) আর্যসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই সমাজের কার্যসূচী কী ছিল? (ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় হিউমের অবদান কী? (ঙ) ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থীদের উদ্ভব কীভাবে হয়? তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম বল। (চ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান কে ছিলেন? সংস্কার আন্দোলনে তাঁর অবদান কী?

৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসে স্মরণীয় কেন?

কারণঃ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে সার্বিয়ার সেরাজেভো শহরে এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড ঐ শহরে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে তাকে কয়েকটি দাবী সম্বলিত এক চরমপত্র দেয়। এই দাবীগুলির অন্যতম ছিল আততায়ীকে ধরে অস্ট্রিয়ার হাতে সমর্পণ করা। এই দাবীগুলি মেনে নেওয়ার জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় দেয়। সার্বিয়া কয়েকটি দাবী মেনে নিয়ে বাকীগুলি মানতে অসম্মতি জানালে অস্ট্রিয়া তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ।

এই যুদ্ধের ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। অনেক দিন থেকেই পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সকে হারিয়ে জার্মানী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে ফ্রান্স, আলসাস ও লোরেন জার্মানীকে দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু সে এই পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারছিল না। ফলে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানী শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এই সময়কার ইংলণ্ড ছিল নৌ বলে বলীয়ান; ফলে জলেও জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম চলে। বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক আগে থেকেই তিক্ত হয়েছিল। বল্কান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সংকটের কারণ ছিল অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল। সার্বিয়ার দাবী ছিল ঐ দুটি রাজ্যের ওপর। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে স্বার্থের সংঘাত ছিল অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার রেষারেষির মূলে। এক্ষেত্রেও জার্মানী ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে।

এই সব পারস্পরিক স্বার্থের কারণে ইউরোপীয় শক্তিগুলি দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হল জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে ত্রি-শক্তি মৈত্রী জোট (Triple Allience), অন্যটি হল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিয়ে গড়া ত্রি-শক্তি

আঁতাত (Triple Entente) উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত হানার জন্য সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। উত্তেজনায় সমগ্র ইউরোপ থর থর করে কাঁপতে থাকে। এই সময়ে দরকার ছিল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের। সেরাজেভোর ঘটনা সেই স্ফুলিঙ্গ যোগালে ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে ; ক্রমে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে।

যুদ্ধের গতি ঃ প্রথম দিকে একপক্ষে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী অন্যপক্ষে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং সার্বিয়া—এই দুই শক্তি জোটের মধ্যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায়, কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব রাজ্যই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়েছে। ফলে বিশ্ব যেন দুটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। নানা আধুনিক সমরাস্ত্র, বোমারু বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের বিভীষিকা ও তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষ এই যুদ্ধের সামিল হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধ চার বছর ধরে চলে। শেষে ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়। পরের বছর ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে জার্মানী মিত্র পক্ষের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

ফলাফল ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের ফল হয়েছিল সর্বাপেক্ষা গভীর এবং ব্যাপক। এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে এত বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারান। কত যে মানুষ সারাজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যান তার ইয়ত্তা নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধ দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জার্মানীতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয়। বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা নির্ধারণের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ফলে ইউরোপীয় মানচিত্রে এক বিরাট রদবদল হয়।

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জয়যুক্ত হয়। দিকে দিকে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সত্ত্বেও জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারী শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থেকেই গেল।

মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই শ্রমিকগণ তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সজাগ হয়। ফলে

সে সব দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করেন। অনেক দেশে শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষায় নানা আইন প্রবর্তন করা হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে নারীজাতির জাগরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী মন্দাও এই মহাযুদ্ধের অন্যতম ফল।

এই যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বরাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের বিভীষিকা দূর করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য **'লীগ অফ নেশনস্'**-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াঃ এদিকে ভারতে ব্রিটিশের একটানা শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্র্য ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট ও জীবনধারণের ক্লেশ ভারতীয় জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ-শাসন বিরোধী মনোভাব তীব্রতর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের বিপ্লবী ও চরমপন্থীদের আন্দোলন এই মনোভাবেরই প্রকাশ।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব ভারতের রাজনীতিতেও এসে পড়ে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ যেহেতু একপক্ষ, সেহেতু ব্রিটিশ ভারতের প্রজাদেরও এই যুদ্ধের সামিল হতে হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন আর যাই হোক, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল; সেহেতু সদ্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়গণ এই যুদ্ধে ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁদের আশা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে ইংরাজ সরকার ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অধিকতর মনোযোগ দেবেন। ভারতীয় বিপ্লবীরাও এই সুযোগে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশে **'যুগান্তর', 'অনুশীলন সমিতি', 'অভিনব ভারত', 'আর্যবান্ধব সমাজ'**, বিদেশে **'গদর পার্টি'** নামে বহু বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। আমেরিকার 'গদর পার্টি' ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার এক পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আনাবার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। যুদ্ধ চলাকালে বাংলা দেশেও বিপ্লবীরা গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য এক গোপন পরিকল্পনা করেন। জার্মানগণ বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আমদানী করে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত, তখন

পুলিশ এই কথা জানতে পেরে বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানায় হানা দিলে বাঘা-যতীনের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী প্রাণপণ যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের এই অধ্যায়ে আরও যে সব তরুণ বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলার ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী, কানাইলাল, মহারাষ্ট্রের চাপেকার ও সাভারকার ভাই-এরা, পাঞ্জাবের অজিত সিং, অম্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়ালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি সম্পূর্ণ থেমে না গেলেও কিছুটা কমে যায়। এই সময় **শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত** এবং **তিলক** ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের দাবীতে **'হোমরুল আন্দোলন'** শুরু করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আনি বেসান্তের হোমরুল লীগ এবং তিলকের 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ' স্থাপিত হয়। তাঁদের এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অনুকূলে না থাকায় হোমরুল আন্দোলন সফল হয় নি। কিন্তু সফল না হলেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

১৯০৬ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগ স্থাপিত হওয়ার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতপার্থক্য ক্রমশঃই বেড়ে যেতে থাকে। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে উভয় দলই লক্ষ্ণৌ শহরের বার্ষিক অধিবেশন ডাকে। এই সময় দুটি দল স্থির করে যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগের 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর' দাবী মেনে নেবে এবং তারপর দুটি দল একযোগে ভারতের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক অধিরাজ্যের মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে। এ নিয়ে দুটি দলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা **'লক্ষ্ণৌ চুক্তি'** নামে খ্যাত। এই চুক্তি অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ভারতীয় রাজনীতিতে অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতাও ইংরাজ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। তাই বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করার জন্য **'রাউলাট অ্যাক্ট'** নামক এক দমনমূলক আইন পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা জনসাধারণের ন্যায় বিচার লাভের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতারা তো বটেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মধ্যপন্থী নেতারা পর্যন্ত এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চারিদিকে রাউলাট আইন-বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। ইংরাজ সরকারও সেই

আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন। জনসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মানুষ এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। হঠাৎ জেনারেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়। চারিদিক ঘেরা ঐ জায়গা থেকে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। ফলে হাজারে হাজারে পুরুষ, নারী ও শিশু অসহায়ভাবে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেয়। **জালিয়ানওয়ালাবাগের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড** সারা দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্রেক করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গান্ধীজীও হতবাক হয়ে যান।

ভারতের জাতীয় নেতারা আশা করেছিলেন মহাযুদ্ধ শেষ হলেই বুঝি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের দাবীদাওয়াগুলি পূরণ করবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে আসেন। তিনি তৎকালীন ভাইসরয় চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ভারতবর্ষে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন তা **'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট'** নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ এবং ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' নামে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার কার্যে পরিণত করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মিত্রপক্ষের গৃহীত নীতি পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানদেরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই নীতি অনুযায়ী পরাজিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই সুলতান আবার খলিফা রূপে মুসলিম দুনিয়ার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সুতরাং তাঁকে স্বমর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বত্র যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয় তা ইতিহাসে **খিলাফৎ আন্দোলন** নামে খ্যাত। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসও এই আন্দোলনে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটি এই কর্মসূচী অনুমোদন করায় ১৯২০ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে **মহাত্মা গান্ধী** (১৮৬৯-১৯৪৮ খৃঃ) একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু দক্ষিণ আফ্রিকায়।

সেখানে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয়দের নানা অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন করে তিনি সফল হয়েছিলেন। তাঁর এই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত নৈতিক আন্দোলন **সত্যাগ্রহ** নামে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সাফল্য এবং তাঁর অভিনব সত্যাগ্রহে মুগ্ধ হয়ে মহামতি গোখেল তাঁকে ভারতে এসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানান। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে এলেও দেখেন, তাঁর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের সময় তখনও আসেনি। তাই তিনি আমেদাবাদে সবরমতী নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দেশ-প্রেমিক ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের আদর্শ শিক্ষা দিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে দু-একটি ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ ও প্রয়োগ পদ্ধতির অভিনবত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। সেই সময়ে রাউলাট আইন বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে গান্ধীজী সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় নেতারূপে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটাই তাঁর প্রথম আবির্ভাব।



মহাত্মা গান্ধী

অনুশীলনী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

২। বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় কে কোন্ পক্ষে যোগ দিয়েছিল? এই যুদ্ধকে মহাযুদ্ধ বলা হয় কেন? কীভাবে এই মহাযুদ্ধের অবসান হয়?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৫। জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কীভাবে হয়?

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (খ) ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কীভাবে শুরু হয়? (গ) হোমরুল আন্দোলন কী? এই আন্দোলনের দুজন নেতার নাম লেখ। (ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কীভাবে সংঘটিত হয়? ভারতবাসীর ওপর এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। (ঙ) খিলাফৎ আন্দোলন কাকে বলে? এই আন্দোলন সম্পর্কে আর কী জান?

● ১৩. বলশেভিক বিপ্লব

পটভূমিকা : ১৯১৭ খৃস্টাব্দের রুশ বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে অত্যাচারী জারতন্ত্রের অবসান হয় এবং রাশিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলে ঐ সব দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু রাশিয়ায় এই আন্দোলনের ঢেউ একেবারেই পেঁছায়নি। সে সময় রাশিয়া ছিল রোমানফ বংশীয় জারের অধীন। জার ছিলেন একাধারে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক। ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেখানে একে একে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত, রাশিয়ার জারেরা তখন দেশে এক নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসন বলতে কিছু ছিল না। প্রতিবেশী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যখন বাণিজ্যিক কারিগরি ও শিল্পে অসাধারণ উন্নতি করেছিলেন তখন রাশিয়ার শাসককুল সে সব বিষয়ে ছিল নিতান্তই উদাসীন। দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমলারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা যাচাই করা হত না। অভিজাতদের মধ্যে থেকেই তাদের নিয়োগ করা হত ; ফলে জনগণ শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ পেতেন না। শাসককুল ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। দুর্নীতির প্রতিবাদ করলে কপালে জুটত হয় নির্মম পুলিশী অত্যাচার, না হয় নির্বাসন। প্রজাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতার বালাই ছিল না। দেশের সেনাবাহিনী আকৃতিতে বিশাল হলেও শক্তিহীন ছিল ; যার পরিণাম রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খৃঃ) রুশীদের শোচনীয় পরাজয়। এই ঘুণধরা সমাজব্যবস্থা ও সেনাবাহিনীর অপদার্থতা সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনগণকে বিক্ষোভ প্রকাশে উৎসাহিত করে তোলে।

বিপ্লবের কারণ : তদানীন্তন জার সম্রাটগণ কিন্তু দেশে সুশাসন প্রবর্তন ও দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা মোচনে আদৌ আগ্রহ দেখান নি। পরন্তু তাঁরা নিজেদের ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং দেশবাসীর ওপর চালাতেন দমন পীড়ন ও অত্যাচার। এই অত্যাচার চরমে ওঠে জার **দ্বিতীয় নিকোলাসের** আমলে। তিনি যদিও জার ছিলেন, তথাপি আসল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল রানী আলেকজান্দ্রা এবং **রাসপুতিন** নামক রাজপুরোহিতের হাতে। প্রজাদের ওপর তাঁদের অত্যাচার এতই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে রাসপুতিনকে প্রাণ হারাতে

হয়। তবুও জার নিকোলাসের চৈতন্যোদয় হয় নি। ফলে রুশ প্রজারা জারতন্ত্রের অবসান ঘটাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় একদিকে ছিল ধনী ও অত্যাচারী অভিজাতশ্রেণী, অন্যদিকে নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক। সমাজের ওপরতলার মানুষের কঠোর নিষ্পেষণে নীচতলার অসহায় মানুষ যখন জর্জরিত, তখন বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী তাদের মধ্যে বিপ্লব চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। ফলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ান।

প্রজাসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অবসানকল্পে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যদিও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তবুও তাদের অবস্থার কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। প্রজাদের দুঃখ কষ্ট যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল। জীবন ধারণের জন্য অনেক সময় তাদের জমিজমা বেচে সর্বস্বান্ত হতে হত। দেশের শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খারাপ। কম মজুরীতে তাদের দিনরাত কারখানায় খাটতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে হত। যুগ যুগ ধরে সইতে হত নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার ও লাঞ্ছনা। অথচ প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। ফলে এই সব শোষিত মানুষের দল নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিপ্লবের পথই বেছে নেয়।

এ সময় ফরাসী বিপ্লবের বাণী জারের অধীনস্থ রুশ জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা জাগায়। রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি, দস্তয়ভোস্কি, তুর্গেনিভ, প্যাভলভ-এর রচনা তাদের উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে। মার্কস, এঙ্গেল্‌স-এর সমাজতান্ত্রিক আদর্শও তাদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ইন্ধন যোগায়।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন এমনই দৈন্যদশা যে যুদ্ধের খরচ যোগাবার ক্ষমতা তার ছিল না। দেশের আমলাতন্ত্র এতই দুর্নীতিপরায়ণ ছিল যে যুদ্ধের জন্য যে সাহস ও মনোবল দরকার তাও তাদের ছিল না। ফলে এই যুদ্ধে রুশীরা জার্মানদের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। শত শত নিরপরাধ রুশ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। দেশের কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্য সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। ফলে তাদের রাগ গিয়ে পড়ে দেশের শাসককুলের ওপর। এভাবেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এছাড়া যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় বিপর্যয়, জারতন্ত্রের দুর্বলতা ও অযোগ্যতাকেই প্রকট করে তোলে। বিপ্লবীরা দেখল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে ক্ষমতা দখলের চরমক্ষণ উপস্থিত।

এরই মধ্যে রাশিয়ায় অনেকগুলি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত

ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েকটি উদারপন্থী রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়। **কার্ল মার্কস**-এর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী দেশের শ্রমজীবী মানুষের দল ঐক্যবদ্ধ হয়। উদারপন্থীরা চাইতেন ইংলণ্ডের মত রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তন করতে; কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা জারের সঙ্গে কোনোরকম আপোষে রাজী ছিলেন না। এঁরা ছিলেন আবার দুটি দলে বিভক্ত। দলে যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের বলা হত বলশেভিক, আর যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁদের বলা হত মেনশেভিক। বলশেভিকদের নেতা **লেনিন** বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পেট্রোগাড শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে সেনাবাহিনী সেই ধর্মঘটে যোগ দেয়। পরে বিপ্লবী কাজকর্ম ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শ্রমিক ও সেনাদের মিলিত প্রয়াসে রাশিয়ার রাজধানীতে এবং অন্যান্য শহরে এক একটি **'সোভিয়েট'** বা সমিতি গঠিত হয়। বাধ্য হয়ে রাশিয়ার রোমান্‌ফ রাজবংশের শেষ বংশধর **দ্বিতীয় নিকোলাস** ১৯১৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে সিংহাসন ত্যাগ করেন। বিপ্লবীরা রাশিয়ায় এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করেন।

কিন্তু এই সরকারও রুশ জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অপারগ ছিল। ফলে রাশিয়ায় আবার অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় বলশেভিকরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বলশেভিকরা ছিলেন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উগ্র সমর্থক। তাঁদের নেতা লেনিন দেশের সমস্ত জমিজমা, কলকারখানা, মূলধন প্রভৃতি জাতীয়করণ করে সেই সমস্ত জিনিস দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠন সোভিয়েটের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা শান্তি, আহার ও বাসস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন। দেশের তৎকালীন অস্থির পরিস্থিতি তাঁর সামনে সুযোগ এনে দেয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন। রাশিয়ায় বলশেভিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে রাশিয়ায় এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ৭ই নভেম্বর দিনটি 'নভেম্বর দিবস' হিসাবে উদযাপিত হয়। রাশিয়ার পঞ্জিকা অনুযায়ী অক্টোবর মাসে এই বিপ্লব হয় বলে একে অক্টোবর বিপ্লব বলে। রাশিয়ার এই বলশেভিকদেরই কমিউনিস্ট বলা হয়।


লেনিন

ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যত্র রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের সাফল্য ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপের অনেক দেশে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঘটে। জার্মানী, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এই আদর্শ বিস্তার লাভ করে ; তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রুশ বিপ্লবের ঢেউ বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এই ভয়ে এই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর নাৎসী ও ইতালিতে ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের মূলে ছিল রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি ঐ দুই দেশের ঘৃণা ও বিদ্বেষ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রমিক অসন্তোষ ও বিপ্লবের ভয়ে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে নানা শ্রমিক-কল্যাণ কর্মসূচী ও শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে থাকে।

রুশ বিপ্লবে রুশীদের সাফল্য বিশ্বের পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীনতালাভে অনুপ্রেরণা যোগায়। ফলে ঐ সব দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। সবশেষে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বে ঐ ধরনের বিপ্লবের সূচনা করে। ফলে দেশে দেশে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব হয়।

অনুশীলনী

১। রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা বর্ণনা কর।

২। এই বিপ্লবের কারণগুলি কী কী ?

৩। কীভাবে রাশিয়ায় জার-এর শাসনের অবসান হয় ?

৪। রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠায় লেনিনের অবদান আলোচনা কর।

৫। ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৬। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ—

(ক) কোন্ কোন্ সাহিত্যিকের রচনা রুশ বিপ্লবীদের মনে প্রেরণা যোগায় ? (খ) বলশেভিক কাদের বলা হয় ? (গ) 'সোভিয়েট' শব্দের তাৎপর্য কী ? (ঘ) নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে কী জান ?

৭। সঠিক তথ্যের পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল তথ্যের পাশে (×) চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় জার-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। [ ]

(খ) লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। [ ]

(গ) রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তদেরই প্রাধান্য ছিল ? [ ]

(ঘ) রাশিয়ার বলশেভিকরা কমিউনিস্ট ছিলেন। [ ]

১৪. ইউরোপ [১৯১৯-১৯৩৯]

প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯ খৃঃ): ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। পরের বছর প্যারিসের শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা সম্মেলনের মত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেও পৃথিবীর বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিগণ প্যারিসে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জড়িত দেশগুলির আঞ্চলিক সীমানার-পুনর্বিন্যাস, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনর্গঠন এবং এমন একটি শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা যাতে ভবিষ্যতে কোনো দেশ আর যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে।

বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের ঐ সম্মেলনে চারজন ছিলেন প্রধান। তাই এঁদের **'প্রধান চার শক্তি'** (**Big Four**) নামে অভিহিত করা হত। এঁরা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের ক্লিমেনশো এবং ইতালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো। বৈঠকে ক্লিমেনশো সভাপতিত্ব করেন।

সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে কতকগুলি গোপন বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিলেন। তাই শান্তির মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলন শুরু হলেও পারস্পরিক স্বার্থের কারণে প্রতিনিধিদের পক্ষে একটি সর্বসম্মত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে একমাত্র উড্রো উইলসনই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পারস্পরিক ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রয়াসের কাজ চালিয়ে যান। এজন্য তিনি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে তাঁর **চোদ্দ-দফা নীতি** ঘোষণা করেন। এর মধ্যে প্রধান দুটি নীতি হল ন্যায়বিচার, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলা। উইলসনের এই উদার ও আদর্শবাদী নীতি সম্মেলনের অনেক নেতারই মনঃপূত হয়নি। তাঁরা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন পরাজিত জর্মানীকে সবদিক থেকেই দুর্বল করতে। সুতরাং প্যারিসের শান্তিচুক্তিতে ওপর ওপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মধ্যে একটি মহাযুদ্ধের আশঙ্কা থেকেই গেল।

প্যারিসে মোট **পাঁচটি চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেগুলি হল: (১) জার্মানীর সঙ্গে ভার্সাই-এর সন্ধি, (২) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জারমেন-এর সন্ধি, (৩) হাঙ্গেরীর

সঙ্গে ট্রিয়ানন-এর সন্ধি, (৪) বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলি-র সন্ধি এবং (৫) তুরস্কের সঙ্গে সেভার্সের সন্ধি।

এই সব সন্ধির মূল কথা ছিল একটাই ; পরাজিত প্রতিপক্ষের শক্তি খর্ব করা, বিশেষতঃ জার্মানীকে জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানীকে তার আলসাসলোরেন ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হয়। জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত প্রাশিয়ার কিছু অংশ বেলজিয়ামকে, কিছুটা পোল্যান্ডকে এবং কিছু অংশ মিত্রশক্তির হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা হয়। জার্মানীর দুই বন্দর মেমেল ও ডানজিগকে মুক্ত বন্দর রূপে ঘোষণা করা হয়। এমনকি আফ্রিকা, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবকটি জার্মান উপনিবেশ ছেড়ে দিতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়।

'সেণ্ট জারমেন'-এর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া, চোকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ট্রিয়ানন-এর সন্ধি অনুযায়ী হাঙ্গেরীকে অস্ট্রিয়া থেকে আলাদা করে একটি নতুন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়। নিউলি-র সন্ধি অনুযায়ী বুলগেরিয়ার কিছু অঞ্চল গ্রীসকে এবং কিছু যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। সেভার্সের সন্ধির ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন হয়। তুরস্কের সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হন। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া এবং মিশর তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তুরস্ক, এশিয়া মাইনরে ক্ষুদ্র পার্বত্য অঞ্চলরূপে কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে মিত্রপক্ষ, জার্মানী ও তার সহযোগী দেশগুলিকে শুধু যে আঞ্চলিক অখণ্ডতা থেকে বঞ্চিত করল তা নয় ; তাদের ওপর চাপানো হল নানা অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতেও জার্মানীকে বাধ্য করা হল। ফলে প্যারিসের সম্মেলন নামেই শান্তি সম্মেলন। আসলে জার্মানী ও তার মিত্র দেশগুলিকে সব দিক থেকে শায়েস্তা করাই ছিল বিজয়ী রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশ্য। ফলে শান্তিচুক্তির আরোপিত শর্তবলী প্রতিটি জার্মানকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং এর মধ্যে উপ্ত হয় আর এক মহাযুদ্ধের বীজ।

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব ঃ প্যারিস সম্মেলনে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিগুলি অনুধাবন করলে দেখা যায়, এগুলির দ্বারা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মহাযুদ্ধের সর্বনাশা পরিণাম যথা লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ, শিল্পের ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি, বেকারত্ব প্রভৃতি ইউরোপের নানাদেশে সমস্যা তীব্রতর করে তোলে। ফলে এই সব দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উদ্ভব হয়। সমসাময়িক কালে এই শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল ইতালি এবং জার্মানীতে।

প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করেছিল। কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইতালি আশানুরূপ উপঢৌকন না পাওয়ায় হতাশ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী অর্লান্ডো সম্মেলন বর্জন করেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে আসে, যার ফলে ইতালির সর্বস্তরে দেখা দেয় চরম বিশৃংখলা এবং অরাজকতা। ইতালির গণতান্ত্রিক শক্তির সাধ্য ছিল না এই অবস্থাকে সামলাবার। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইতালিতে এই শক্তির যাঁরা উৎস তাদের বলা হত **ফ্যাসিস্ট** এবং তাঁদের অনুসৃত নীতি হল **ফ্যাসিবাদ**। ল্যাটিন শব্দ 'ফ্যাসিও' অর্থাৎ 'দণ্ড' থেকেই এই নামের উৎপত্তি।

বেনিটো মুসোলিনী নামে এক নেতা দেশের অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের সংকট কাটবে—এই বিশ্বাসে দেশের হাজার হাজার মানুষ এবং মহাযুদ্ধ ফেরত সৈনিক এই সৈন্য-দলে যোগ দেয়। এঁদের পরণে থাকত কালো শার্ট এবং প্রাচীন রোমান শাসকদের ক্ষমতার প্রতীক রাজদণ্ড। ফ্যাসিও-র মত এঁদেরও প্রতীক ছিল দণ্ড। তাই এঁদের বলা হত 'ফ্যাসিস্ট', ফ্যাসীবাদীরা ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সামরিক কায়দায় দেশ শাসন করা ছিল এঁদের নীতি।



বেনিটো মুসোলিনী

এঁদের সাহায্যে ১৯২২ খৃস্টাব্দে মুসোলিনী রোম অভিযান করে দখল করে নেন। ইতালির রাজা **ভিক্টর তৃতীয় ইমানুয়েল** বিনা প্রতিবাদে মুসোলিনীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেন। এরপর মুসোলিনী সকল বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করে ইতালিতে আবার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে হন তার সর্বাধিনায়ক। ক্ষমতা দখলের পর তিনি ইতালির পুনর্গঠনের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে ইতালি পুনরায় এক শক্তিশালী দেশরূপে গড়ে ওঠে।

ইতালির অনুকরণে জার্মানীতে **নাৎসী** (Nazi) নামক এক শক্তিশালী দলের উদ্ভব হয়। ফ্যাসিস্টদের মত নাৎসীরাও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। দেশে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল নাৎসীদের লক্ষ্য।

ইতালির মত যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীতেও সর্বক্ষেত্রে সংকট প্রকটরূপে দেখা দেয়। উপরন্তু ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী একদিকে যেমন জার্মানীকে সবদিক থেকে আঘাত হানে, অন্যদিকে এই অপমানজনক শর্তাবলী জার্মানদের অন্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে তীব্র করে তোলে। জার্মানীর তদানীন্তন সরকার সাম্যবাদী আদর্শকে ঠেকালেও জনগণের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে বা তাদের নতুন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে **অ্যাডলফ হিটলার** নামক জনৈক সৈনিক তাঁর **'মেইন ক্যাম্ফ'** (Mein Kampf) বা 'আমার সংগ্রাম' শীর্ষক একটি গ্রন্থে একটি রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। গ্রন্থটিতে তিনি প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জার্মানী থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন এবং গণতন্ত্রের বিলোপসাধন। এক কথায়, ছলে বলে কৌশলে ইউরোপের সমস্ত জার্মান ভাষাভাষী মানুষদের নিয়ে বিশাল জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করে জার্মানীকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিধর জাতিরূপে গড়ে তোলাই ছিল হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য।



অ্যাডলফ হিটলার

তাঁর কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে সর্বশ্রেণীর জার্মান তাঁর নতুন দলে যোগ দেয়। ফলে অচিরেই হিটলার এবং তাঁর নাৎসীদল জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৩২ খৃস্টাব্দে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে হিটলার **হিনডেনবার্গ**-এর কাছে পরাজিত হন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিটলারকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলার) নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হিটলার রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে দেশে নাৎসী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে তিনি একাধারে চ্যান্সেলার ও 'ফুয়েরার' (সর্বাধিনায়ক) নামে পরিচিত হন। সেই থেকেই জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয় চ্যান্সেলার।

এরপর তাঁর নেতৃত্বে জার্মানীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। জার্মান জনগণের মন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে

ফেলা এবং ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তাবলী অমান্য করে জার্মানীর হৃত রাজ্যগুলিকে পুনরায় জয় করে নেওয়া হল হিটলারের পরবর্তী কার্যক্রম। ফলে একদিকে যেমন সব ক্ষেত্রেই জার্মানীর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে তার এই আগ্রাসী নীতিতে পৃথিবীর জাতিসমূহ আবার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। পৃথিবীর আকাশে ঘনিয়ে আসে আরো একটি মহাযুদ্ধের কালো মেঘ।

জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকেই জাতিসঙ্ঘের জন্ম। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা পৃথিবীতে উত্তেজনা কমানো এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন তাঁর চোদ্দদফা নীতিতে এরূপ একটি বিশ্বসংস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। সেই অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতিসংঘের গঠনতন্ত্র রচিত হয় এবং প্যারিস শান্তি সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ সেটি অনুমোদন করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২০ খৃস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে **জাতিসংঘের** প্রতিষ্ঠা হয়। এর সদর কার্যালয় স্থাপিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে।

এই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকাও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে।

জাতসংঘের চারটি প্রধান অঙ্গ ছিল, যথা একটি সমিতি (Assembly), একটি পরিষদ (Council), একটি স্থায়ী কার্যালয় (Secretariat) এবং একটি আন্তর্জাতিক আদালত (Court of International Justice)। প্রথম বত্রিশজন সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘের কাজ শুরু হয়। পরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় বাষট্টিতে। জাতিসংঘের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এটি অবশ্য জাতিসংঘের অঙ্গ ছিল না। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই সংস্থার কাজ ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম বিরোধের মীমাংসা এবং পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিশ্বসংস্থা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু যেখানে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত সেখানে জাতিসংঘ তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিরিশের দশকে জাপান

যখন মাঞ্চুরিয়া দখল করতে উদ্যোগী হয়, অথবা ইতালি ও জার্মানী যখন সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নেশায় মেতে উঠল তখন তাদের নিরস্ত করার সাধ্য জাতিসংঘের ছিল না। তবুও স্বীকার করতে হয়, জন্মের শুরু থেকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত জাতিসংঘ যেভাবে বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাসে সাহায্য করেছিল তাতে মানুষের শান্তির প্রতি আগ্রহই লক্ষ্য করা যায়। মানুষের এই শান্তিপ্রিয়তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার সীমানা বিরোধ মিটে যায়। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং মানবিক সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। প্রাচ্য দেশসমূহে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির দূরীকরণে এই বিশ্বসংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার যে আশা নিয়ে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি এতই ক্ষমতালিপ্সু ছিল যে, তারা জাতিসঙ্ঘের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে কিছুতেই চাইত না। আবার যেহেতু জাতি-সঙ্ঘের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না, সেহেতু সে তার নির্দেশ অমান্যকারী দেশের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত না। এই অবস্থায় জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া এবং ইতালি আবিসিনিয়া দখল করতে উদ্যত হলে জাতিসঙ্ঘ জাপান ও ইতালির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে চায়। ফলে উভয় দেশই জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ ত্যাগ করে। আমেরিকা আগে থেকেই এর বাইরে ছিল। সবশেষে হিটলারের জার্মানী জাতিসঙ্ঘ থেকে সরে আসায় এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই বিশ্বসংস্থাটির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হয়।

অনুশীলনী

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এই সম্মেলনের সামনে সমস্যাই বা কী ছিল? কে কীভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করেন?

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মোট কয়টি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? জার্মানীকে যে সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়, তার প্রধান শর্তাবলী কি ছিল? জার্মান জনগণের ওপর এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ কাকে বলে? একজন ফ্যাসিস্ট এবং একজন নাৎসী নেতার নাম এবং তাঁদের সম্পর্কে যা জেনেছ লেখ।

৪। জাতিসঙ্ঘের উৎপত্তি কিভাবে হয়? এর প্রধান প্রধান অঙ্গের নাম কর। জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫। জাতিসঙ্ঘের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ দাও।

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চার প্রধান কে কে? এঁদের ভূমিকা কি ছিল? (খ) 'চৌদ্দ-দফা-নীতি' কে উদ্ভাবন করেন? শান্তি সম্মেলনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল? (গ) 'ফ্যাসিবাদ' কথাটির উৎপত্তি কী থেকে হয়? কাদের ফ্যাসিস্ট বলা হয়? (ঘ) নাৎসী কাদের বলা হয়? নাৎসী মতবাদের বৈশিষ্ট্য কী? (ঙ) তোমার মতে জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার মূলে কোন কারণটি সর্বাপেক্ষা দায়ী?

৭। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর:

(ক) —— খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন হয়। (খ) ফ্যাসিস্ট শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ —— থেকে। (গ) —— হিটলারের লেখা একটি বই। (ঘ) ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে —— এর প্রতিষ্ঠা হয়। (ঙ) এর সদর কার্যালয় সুইজারল্যাণ্ডের —— শহরে অবস্থিত ছিল।

৮। বাম সারিতে কয়েকজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ডান সারিতে তাঁদের পরিচয় বা অবস্থিতি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। যাঁর যা পরিচয় বা যেখানে যার অবস্থিতি বন্ধনীর মধ্যে তার ক্রমিক সংখ্যাটি বসাও।

(ক) কাভুর	[ ]	১। জার্মানীর সর্বাধিনায়ক
(খ) হিটলার	[ ]	২। জেনেভা
(গ) মাৎসিনী	[ ]	৩। ইতালীর বিপ্লবী
(ঘ) জাতিসঙ্ঘের সদর দপ্তর	[ ]	৪। একজন মন্ত্রী

১৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

কারণ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুটি দশক যেতে না যেতেই পৃথিবী আবার একটি মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হয়। এই মহাযুদ্ধ আগেরটির অপেক্ষা আরও ভয়াবহ এবং ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয়টির পিছনেও নানা কারণ বর্তমান ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের আসল উদ্দেশ্য ছিল পরাজিত জার্মানীকে সব দিক থেকেই কোণঠাসা করে রাখা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা জার্মানীর ওপর এমন সব শর্ত চাপিয়ে দিল যে সেই পরিস্থিতিতে সেগুলি মেনে নেওয়া ছাড়া জার্মানীর উপায় ছিল না। কিন্তু সেই অপমান জার্মানরা ভুলতে পারছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধির সেই অপমানজনক শর্তাবলী অমান্য করতে থাকে। এরই পরিণামে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়।

ইতালির ফ্যাসিবাদ এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তোলে। এই সব দেশের শাসককুল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করে দিয়ে ঐ সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নেশায় মেতে ওঠেন। জাপান দখল করে মাঞ্চুরিয়া, ইতালি আবিসিনিয়া ; তাদের দেখাদেখি জার্মানীও সাম্রাজ্য বিস্তারে লেগে পড়ে। রাশিয়াও নিশ্চেষ্ট ছিল না। সেও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি দখলে এনে তার মধ্য দিয়েই ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ খুঁজছিল।

এই অবস্থায় অপর দুই শক্তিশালী দেশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যদি প্রতিরোধ গড়ে তুলত তাহলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু তারা জার্মানী ও ইতালিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করল। এর কারণও ছিল। একদিকে ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে রাশিয়ার সাম্যবাদ এর কোনোটিই এই পশ্চিমী দেশ দুটি চাইছিল না। পরন্তু অর্থনৈতিক সংকট আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ এবং সর্বোপরি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইতালি জার্মানী কর্তৃক আক্রমণের ভয় দুটি দেশকে নিশ্চেষ্ট থাকতে বাধ্য করে। একদিনে জার্মানী ইতালি, অন্যদিকে রাশিয়া এ দুটির মধ্যে তারা প্রথম দুই শক্তিকে খুশী রাখা শ্রেয় বলে মনে করে। মুসোলিনী, হিটলার অপেক্ষা রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শকে এরা বেশী ভয় করত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের—এই

নিশ্চেষ্টতার সুযোগ নিয়ে হিটলার ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করে অস্ত্রসজ্জা, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জয়, রাইন অঞ্চলে জার্মান বাহিনী মোতায়েন প্রভৃতি জঙ্গী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। হিটলারের এই শক্তিবৃদ্ধিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা জার্মানী ও ইতালির প্রতি নরম মনোভাব দেখায়। কিন্তু এটা করে তারা মারাত্মক ভুল করেছিল। কারণ তাদের নিশ্চেষ্টতার সুযোগ নিয়ে হিটলার ধাপে ধাপে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন।

ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জয়, রাইন অঞ্চলে জার্মান সৈন্য মোতায়েন ইত্যাদিতে রাশিয়া ভীত হয়। ফলে রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে **'অনাক্রমণ চুক্তিতে'** আবদ্ধ হয়।

এদিকে যার হাতে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার, সেই জাতিসঙ্ঘ তখন মৃতপ্রায়। কারণ ইতিমধ্যে সে জার্মানী, ইতালি ও জাপানের আগ্রাসী মনোভাবকে রুখতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব উত্তেজনা প্রশমনেও তার কোনো কার্যকর ভূমিকা নেই। এমতাবস্থায় জাপান ও জার্মানী সদস্যপদ ত্যাগ করায় জাতিসঙ্ঘের আর কোনো গুরুত্ব রইল না। ফলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আরও অনেক দেশ জাতিসঙ্ঘ ছেড়ে চলে যায়।

ফলে হিটলার দেখলেন, পরিস্থিতি সবদিক থেকেই তাঁর অনুকূল। ফলে তিনি বাল্টিক সাগরের ডানজিগ বন্দর ও পোল্যান্ডের ওপর আঘাত হানতে সচেষ্ট হলেন। এবার আর ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার উপায় ছিল না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করলেন হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলন্ড ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের পক্ষ নেবে। কিন্তু এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। এর দুদিন পর ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি পরপর এক এক পক্ষ নিয়ে এই যুদ্ধে যোগদান করে। পৃথিবী আবার দুটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়—এক, জার্মানী, ইতালি ও জাপানের সমন্বয়ে গড়া **অক্ষ শক্তি** (Axis power) ; দুই, ইংলন্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার সমন্বয়ে গড়া **মিত্র শক্তি** (Allied power)। একটানা ছ' বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলিতে এই ভয়ংকর যুদ্ধ চলে। মানুষের ইতিহাসে এত বড় ধ্বংস-লীলা আর বুঝি সংঘটিত হয়নি।

পূর্ব রণাঙ্গনে মিত্র শক্তির কাছে জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের (২রা সেপ্টেম্বর,

১৯৪৫ খৃঃ) সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। জার্মানী ও ইতালি আগেই পরাজয় স্বীকার করেছিল।

যুদ্ধের ফলাফল ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ঘটনা। একে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক সুদূরপ্রসারী।

যুদ্ধের শেষদিকে আমেরিকার নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমায় জাপানের দুটি শহর হিরোসিমা ও নাগাসাকি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা এবং রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয় দেশের স্থান হয় দ্বিতীয় সারিতে। ইতালিতে ফ্যাসিবাদী সরকারের জায়গায় প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হয়ে হয় পূর্ব-জার্মানী এবং পশ্চিম-জার্মানী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্যবাদী আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে রাশিয়া ছিল এই মতবাদের প্রবক্তা। কিন্তু চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানীও রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরে প্রজাতন্ত্রী চীনও নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়।

একে কেন্দ্র করেই আবার পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী এবং তাদের মিত্র দেশগুলি, অন্যদিকে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ। এরই মধ্যে কয়েকটি দেশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ভারত তার অন্যতম। এর পর থেকে সবসময় ভারত এবং অন্যান্য জোটনিরপেক্ষ দেশ বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করে উত্তেজনা হ্রাসে সাহায্য করে আসছে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বুঝতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরী নেই। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁরা নিজ নিজ উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দানে তৎপর হয়। ফলে অনেক দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের ভারতবর্ষ তার অন্যতম।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা এই বিশ্বযুদ্ধের শেষেই হয়েছিল (২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫ খৃঃ)। সেই থেকে এই সংস্থা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

১। কী কী কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় ?

২। ভার্সাই সন্ধি-চুক্তির মধ্যে কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল, দেখাও।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি বলতে কী বোঝ ?

(খ) অনাক্রমণ চুক্তিতে কোন্ কোন্ দেশ স্বাক্ষর করে ?

(গ) জাপান কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ?

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার আগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূমিকা কী ছিল ?

(ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন্ ফল আজও লক্ষ্য করা যায় ?

৫। ইতিহাসে নিম্নোক্ত তারিখগুলির গুরুত্ব কী ?

(ক) ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ ; (খ) ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ ; (গ) ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৫।

৬। টীকা লিখ :

অনাক্রমণ চুক্তি ; ভার্সাই চুক্তি ; হিরোসিমা-নাগাসাকি ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজবাদ গ্রহণ করে এমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম বল।

৮। নিরপেক্ষ দেশরূপে ভারতের ভূমিকা কী বল।

● ১৬. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়
[১৯১৯-১৯৪৭]

অসহযোগ আন্দোলন ঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে তাই ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। গান্ধীজী এই অহিংস অসহযোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 'খলিফা'কে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্য আছে। সেগুলি হল, পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা এবং স্বরাজ্যের দাবী স্বীকারে ইংরাজকে বাধ্য করা। গান্ধীজীর মত হল, দেশবাসী যদি অহিংস উপায়ে সংকল্পে অটল থেকে নিজ নিজ কর্মসূচী পালন করেন তাহলে শাসকদলের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবেই। তার ফলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, আইনসভা, স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, সরকারী অফিস কাছারী ইত্যাদি বর্জন, সরকারী অনুষ্ঠান পরিহার, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দ্রব্য ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা। মাদক দ্রব্য বর্জন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা, জাতীয় আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী।

১৯২০ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আইন-জীবীরা আদালত ছেড়ে, ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে শ্রমিকরা কল-কারখানা ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। দেখতে দেখতে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের সর্বত্র স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সাড়া পড়ে যায়। তেমনি বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং ঐসব দ্রব্যাদির দোকানের সামনে পিকেটিং চলে। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, লালা লাজপৎ রায়, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুর মত জাতীয় নেতারাও এই আন্দোলনের সামিল হন।

সরকারী দমননীতিও পুরোদমে চলতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার বরণ করেন। জেলখানা ভরে যায়। সরকারী দমননীতি ও অত্যাচারের প্রতিবাদে একদল উত্তেজিত জনতা উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে বাইশ জন পুলিশ পুড়ে মরে। এই হিংসাত্মক ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধীজী মর্মাহত হন। অহিংস আন্দোলন হিংসার রূপ নিয়েছে দেখে তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দেন (১৯২২ খৃঃ)।

গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে অনেকেই ভালো মনে নেননি। সমগ্র দেশ যখন এই আন্দোলনের অংশীদার তখন মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের হিংসাত্মক কাজের জন্য দেশব্যাপী এতবড় একটা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত হয়নি। এই কাজ করে গান্ধীজী মারাত্মক ভুল করেছেন। অন্য যাঁরা গান্ধীজীর মত সমর্থন করেন তাঁদের যুক্তি হল সম্পূর্ণ অহিংস এই আন্দোলন হিংসার পথ পরিগ্রহ করছে দেখে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে সে সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট করেন। সুতরাং তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং সময়োচিত।

কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ: ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে শুধু যে বুদ্ধিজীবী মহল বিদ্রোহ করেছিলেন তা নয়। কৃষক ও শ্রমিকরাও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের আগে এবং আন্দোলন চলাকালেই কৃষক ও শ্রমিকগণ তাদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বিক্ষোভ জানাতে থাকে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, খাজনা ও অন্যান্য করের পরিমাণ হ্রাস, জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ এবং মহাজনদের অত্যাচার থেকে বাঁচা প্রভৃতি ছিল তাদের দাবী। জমিদার এবং মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯২১ খৃস্টাব্দে একদল উত্তেজিত কৃষক উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে গুজরাট, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে। ১৯২৮ সাল থেকে সারা দেশ জুড়ে এক অসন্তোষ দেখা যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিম ভারতের গুজরাটে বল্লভভাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন (No Tax Compaign) শুরু করেন। কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকরাও নিজ নিজ দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রামে নেমে পড়েন। তখন কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন ছিল কম, কাজের সময় ছিল বেশী, জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক নীচে। কাজেই মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অসন্তোষ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই শ্রমিকরা দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করেন। ১৯২০ সালে বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সুতোকলগুলিতে এবং জামশেদপুরের লোহা ও ইস্পাত কারখানায় যে ধর্মঘট ডাকা হয় তাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যোগ দেন। পরে সেই ধর্মঘট আসামের চা বাগিচা এবং দেশের কয়লাখনি অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব ধর্মঘট রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলে। কৃষক ও শ্রমিকরা দলে দলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করলে আন্দোলনের তীব্রতা ও গতিবেগ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন

আন্দোলনে সংহত রূপ লাভ করে। ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠন **সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস** এবং ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত কৃষকদের সর্বভারতীয় সংগঠন **কৃষাণ-সভা** এই সব আন্দোলনেরই সংহত রূপ।

আইন অমান্য আন্দোলন ঃ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার পর ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কিছুটা হতাশার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কিছু দিনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫ খৃঃ) পর সে দলও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে। পরের বছর ২৬শে জানুয়ারি দিনটি পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন। দেশবাসীর এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করে গান্ধীজী তাদের পরবর্তী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানালেন। সেই সঙ্গে তিনি বড়লাট লর্ড আরউইনকে কয়েকটি দাবি সম্বলিত এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই দাবিগুলির অন্যতম ছিল লবণ উৎপাদনের ওপর যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আছে তা উঠিয়ে নেওয়া। আরউইন গান্ধীজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে গান্ধীজী ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সহকর্মীকে নিয়ে সবরমতী থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। প্রায় দুশো মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে পেঁছান। পরের দিন সকালে সমুদ্রে স্নান করে একমুঠো লবণ তুলে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পুলিশের লাঠি, গুলি ও অত্যাচার উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য গান্ধীজী ধরসানা নামক স্থানে অবস্থিত এক নুনের গোলা দখলের হুমকি দিলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তা সত্ত্বেও সত্যাগ্রহীরা ধৈর্যের সঙ্গে অহিংস সত্যাগ্রহ চালিয়ে যেতে থাকেন। হাজার হাজার মহিলাও এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এখানে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী **খান আবদুল গফ্‌ফর খান**। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যার নাম **খোদা ই-খিদমৎ-গার**। এর অর্থ ঈশ্বরের সেবক। এই দলের সদস্যদের শৃঙ্খলাবোধ, আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ আইন অমান্য আন্দোলনকে স্বতন্ত্র এক মর্যাদা দিয়েছিল।

ভারত ছাড় আন্দোলন ঃ পুলিশী অত্যাচার, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার, দেশব্যাপী

অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে আসে। ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসকে এই বৈঠকে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানালে কংগ্রেস এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে। কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় (১৯৩০-৩১ খৃঃ)। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যাতে যোগদান করে তার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা না থাকায় কংগ্রেসও ভাইসরয় আরউইন-এর সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়। ফলে গান্ধী-আরউইন বৈঠক বসে এবং বৈঠকে **গান্ধী-আরউইন চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-রূপে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান (১৯৩১ খৃঃ) করেন। কিন্তু সে বৈঠকও নিষ্ফল হলে শূন্য হাতে তিনি দেশে ফিরে দেখেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর ব্রিটিশের দমন পীড়ন সমানে চলছে। ফলে তিনি আবার নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁকে ও অন্য সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে ইংরাজ সরকার বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও



মহম্মদ আলি জিন্নাহ



জওহরলাল নেহরু

অসন্তোষকে দূর করার জন্য কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করা প্রয়োজন। এজন্য ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে ভারতশাসন আইন প্রবর্তন করা হয়।

কিন্তু এতে কংগ্রেসের মূল দাবী স্বরাজ না মেনে নেওয়ায় ভারতীয়রা হতাশ হয়। যাইহোক, তারপরও এদেশে ব্রিটিশ শাসন চলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ নেতা **মহম্মদ আলি জিন্নাহ্** দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করে ঘোষণা করেন যে হিন্দু ও মুসলমান যেহেতু দুটি আলাদা জাতি সেহেতু মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই। তাঁর এই আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী ১৯৪০ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয়। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেসের নীতি কী হবে তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। গান্ধী ও জওহরলাল এই যুদ্ধে ব্রিটিশকে সমর্থন করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র চাইতেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেন যখন বিপর্যস্ত তখন তাকে চরম আঘাত হেনে ভারতের স্বাধীনতালাভের এক মহাসুযোগকে কাজে লাগান। কিন্তু যুদ্ধে একের পর এক রণাঙ্গনে জার্মানীর সাফল্য এবং মিত্রশক্তির বিপর্যয় কংগ্রেসের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়। কংগ্রেস জানায়, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবাসীকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে—এই মর্মে যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটেনকে সাহায্য করবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী ছিলেন না।

কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানীদের একের পর এক সাফল্য ইংরাজদের ভারতীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করে। ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য চার্চিল স্যার **স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে** ভারতে পাঠান (১৯৪২ খৃঃ)। এর নাম ক্রীপস দৌত্য। ক্রীপস ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার কোনো উল্লেখ না থাকায় অথবা পাকিস্তান গঠনের দাবী মেনে না নেওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ক্রীপস-এর চেষ্টা ব্যর্থ হলে মহাত্মা গান্ধী ইংরাজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৮ই আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরের দিন সকাল থেকে সারা দেশে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' (Quit India Movement) শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে নেতৃত্বহীন আন্দোলন এক হিংসাত্মক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়।

সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতি ধ্বংস করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে, ডাকঘর পুড়িয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করে আন্দোলনকারীরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। বাংলার মেদিনীপুরে জনগণ অভূতপূর্ব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে কাঁথি ও তমলুকে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ-প্রসঙ্গে মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নির্বিচারে অত্যাচার, উৎপীড়ন, গ্রেপ্তার এবং গোলাগুলি চালিয়ে এই আন্দোলন দমন করেন। হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করেন। কত মানুষ যে পুলিশী অত্যাচার ও গুলিবর্ষণে প্রাণ হারান তার ইয়ত্তা নেই। আন্দোলন থামল, কিন্তু ইংরাজ বুঝল ভারতে তাদের শাসন আর বেশী দিন নেই।

নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ঃ ভারতে যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলছে সে সময় ভারতের বাইরে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মত বিরোধের জন্য সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করে **ফরওয়ার্ড ব্লক** নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। তারপর সরকার-বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিজ গৃহেই অন্তরীণ করে রাখা হয়। সেই অবস্থায় ১৯৪১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। পথে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে তিনি রাশিয়া হয়ে জার্মানীতে এসে পেঁছিলেন। জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি বার্লিন কেন্দ্র থেকে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ভারতবাসীকে সজাগ করে তুলতে থাকেন এবং সেখানে জার্মানদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক বিপ্লবী



সুভাষচন্দ্র বসু

সেনাবাহিনী গঠন করেন। এখানে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে নেতাজী রূপে বরণ করেন এবং 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

সে সময় টোকিওতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু **'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ'** গঠন করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের হাতে পরাজিত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি **আজাদ হিন্দ বাহিনী** গঠন করেন (১৯৪০ খৃঃ)। তাঁরই আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে এক দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার পর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে এলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। ঐ বছরের ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় (অক্টোবর ২১, ১৯৪০ খৃঃ)। পরের বছর সুভাষচন্দ্র জাপান সরকারের সহায়তায় তাঁর বিশাল আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে পরাধীন স্বদেশভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর 'দিল্লী চলো' আহ্বান সৈন্যদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। আজাদ হিন্দ বাহিনী দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ এবং মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল দখল করে। মৈরাং-এ প্রথম স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। অন্যদিকে এই বাহিনী কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

কিন্তু এই সময়ে মিত্র শক্তির হাতে জাপানীদের পরাজয়ের ফলে জাপান আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতি সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যাভাব ও প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তির জন্য এই বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত এই বাহিনী ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কীর্তিকলাপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বস্তুতঃ নেতাজী তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ও সামরিক শক্তির দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী-কালে ভারতের নৌবিদ্রোহও (১৯৪৬ খৃঃ) ব্রিটিশকে স্তম্ভিত করে তোলে। তাঁরা বুঝতে পারেন ভারতকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদের ওপর সামরিক কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, বেতনহার ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, ভারতের বাইরে অন্যত্র বদলী ইত্যাদির কারণে ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে এই বিদ্রোহ দেখা যায় বোম্বাই-এ 'তলওয়ার' নামক জাহাজে। পরে এই বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য নৌ ঘাঁটিতে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভঃ ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে ক্লীমেণ্ট অ্যাটলি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতের দাবীগুলির প্রতি তিনি বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পরে তিনি ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেন। সেই অনুযায়ী এক মন্ত্রী-মিশনকে ভারতে পাঠানো হয় (১৯৪৬ খৃঃ)। এরই নাম ক্যাবিনেট মিশন। এই



মিশন ভারতের স্বাধীনতা অর্পণের জন্য এক রূপরেখা প্রস্তুত করেন। কিন্তু তা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর মনঃপূত হল না। শেষে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন শেষ ভাইসরয়রূপে এসে উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে দেশ বিভাগের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করেন। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত বিখণ্ডিত হল। বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম

পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান ও অবশিষ্ট অংশ হল ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে **ভারতের স্বাধীনতা আইন** পাশ হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়।

১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতীয় গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সেই অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন ঘোষণা করেন। এক আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন, "সারা বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, তখন নবজীবন ও মুক্তিলাভ করে ভারতবর্ষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। একটি জাতির জীবনে এরকম মুহূর্ত খুব কমই আসে এবং এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমরা আমাদের মাতৃভূমি ও বৃহত্তর মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ করছি।"

একশ নব্বই বছর আগে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের যে স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তা আবার ভারতের পূর্ব দিগন্তকে রক্তিম আভায় রঞ্জিত করে উদিত হয়। ভারতের ইতিহাসে তাই ঐ দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

এরপর তিন বছর ধরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গণপরিষদের সদস্যগণ সংবিধান রচনা করেন। ১৯৫০ খৃস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হয়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

অনুশীলনী

১। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বর্ণনা কর। এই আন্দোলন কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে? অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী?

২। ভারতে কৃষক ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণ কী? এই অসন্তোষ কীভাবে আন্দোলনের রূপ নেয় লেখ।

৩। কে, কীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন? এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৪। ভারত ছাড় আন্দোলনের পটভূমিকা বর্ণনা কর। এই আন্দোলনের বিবরণ দাও।

৫। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়? নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অগ্রগতির বিবরণ দাও। এই বাহিনীর অসাফল্যের কারণ কী?

৬। ব্রিটিশ কীভাবে ভারতীয়দের হাতে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়? এর জন্য ভারতীয়দের কী মূল্য দিতে হয়েছিল?

৭। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) 'চৌরিচৌরা' কোথায়? ইতিহাসে এর গুরুত্ব কী? (খ) 'ডাণ্ডি অভিযান' কী? ইতিহাসে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কী জান? (গ) 'সীমান্ত গান্ধী' কার নাম? তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল সম্পর্কে কী জান? (ঘ) 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' কখন এবং কেন স্বাক্ষরিত হয়? (ঙ) 'ক্রীপস্ দৌত্য' সম্পর্কে কী জান লেখ। (চ) 'ভারতছাড়' আন্দোলনের অপর নাম কী? এই আন্দোলনের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (ছ) 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? কীভাবে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়? (জ) 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা, সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(ক) কখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়? (খ) একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের নাম বল। (গ) কে, কীভাবে প্রথম আইন অমান্য করেন? (ঘ) কংগ্রেস কোন্ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিল? (ঙ) মুসলিম লীগের নেতা কে ছিলেন? (চ) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস কত খৃস্টাব্দে ভারতে আসেন? (ছ) ভারতের শেষ ভাইসরয় কে? (জ) 'ক্যাবিনেট মিশন' কী? (ঝ) ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাশ হয়? ভারতে স্বাধীনতালাভের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

৯। নীচের ঘটনাগুলি ইতিহাসের সাল তারিখ অনুযায়ী পর পর সাজাও :

(ক) মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন ; (খ) ভারত ছাড় আন্দোলন ; (গ) নৌ-বিদ্রোহ, (ঘ) প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ; (ঙ) আইন অমান্য আন্দোলন ; (চ) অসহযোগ আন্দোলন ; (ছ) ভারতের স্বাধীনতা লাভ ; (জ) ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫।

১০। সঠিক তথ্যের পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল তথ্যের পাশে (×) চিহ্ন বসাও।

(ক) 'কিষাণ সভা' কৃষকদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। [ ]

(খ) আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। [ ]

(গ) মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেন। [ ]

(ঘ) সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। [ ]

(ঙ) ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে। [ ]

(চ) পাকিস্তান কথাটির অর্থ পবিত্র স্থান। [ ]

১৭. চীনা বিপ্লব [১৯১১-১৯৪৯]

চীন প্রজাতন্ত্রের বিভাজন : ১৯১২ খৃস্টাব্দে মাঞ্চু সম্রাটের পদত্যাগের পর কুয়োমিনটাং দলের ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু দেশের স্বার্থে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ইউয়ান-শি কাই-এর অনুকূলে পদত্যাগ করলে তিনিই হন এই দেশের রাষ্ট্রপতি। সান-ইয়াৎ-সেন আশা করেছিলেন, শক্তিশালী সমর-অধিনায়ক ইউয়ান-এর হাতে চীন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হয় নি।

আসলে ইউয়ান ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং চরম স্বার্থপর। দেশকে শক্তিশালীরূপে গড়ে তোলার চেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রতি তিনি বেশী নজর দিতেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চীনে তাঁরই নামাঙ্কিত এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রচেষ্টায় বাধা দিলে সান-ইয়াৎ-সেনের কুয়োমিনটাং দলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ইউয়ান ঐ দলের সদস্যদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং শেষ পর্যন্ত চীনের নতুন সংসদ থেকে ঐ দলের প্রতিনিধি সদস্যদের বহিষ্কার করেন। তারপর সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজে চীনের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এরপর চীনে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতী হবার আগেই ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমর-নায়কদের কর্তৃত্ব : ইউয়ান-এর মৃত্যুর পর চীনে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার নামে মাত্র থাকলেও রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষমতা চলে যায় **'তু-চুন'** নামক সমর-নায়কদের হাতে। এঁরা বিভিন্ন প্রদেশের সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ছিল না এঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার। ফলে দেশ চরম নৈরাজ্যের হাতে চলে যায়।

দেশের এই দুর্দিনে সান-ইয়াৎ-সেন এগিয়ে আসেন। তাঁর কুয়োমিনটাং দল পুনর্গঠিত হয়। এই দলের নেতারা সমর-নায়কদের উপেক্ষা করে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে উত্তর চীনের ক্যাণ্টন শহরে এক সাংবিধানিক সরকার গঠন করেন। সান-ইয়াৎ-সেন হন এই নবগঠিত সরকারের সভাপতি। এরপর সমর-নায়কদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সান-ইয়াৎ-সেন চীন প্রজাতন্ত্রকে জঙ্গী নেতাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

রাশিয়া প্রথম থেকেই চীনের এই জাতীয়তাবাদী দলটিকে সাহায্য করার জন্য তৈরী ছিল। ফলে রুশ সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী দলটি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

৪ঠা মে'র আন্দোলন : ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে। চীনে বারংবার বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বিশেষতঃ জাপান চীনের জার্মান অধিকৃত এলাকা সাণ্টুং দখল করলে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মে হাজার হাজার ছাত্র পিকিং-এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ পরে অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের মুখে ছিল বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ধ্বনি, বিদেশী পণ্য-সামগ্রী বয়কটের আহ্বান। পরে পরে দেশের শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য জীবিকার মানুষও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সময় চীনে মার্কসবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চীনের উন্নতিকল্পে অনেকে সমাজতন্ত্রকে আদর্শ পদ্ধতি হিসাব গ্রহণ করেন।

ছাত্র আন্দোলনের এই সুযোগে সান-ইয়াৎ-সেন ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁর **তিন দফা সূত্র** বা কর্মসূচী প্রচার করেন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র—এই হল তিন দফা কর্মসূচী। 'গণতন্ত্র' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত এবং জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত শাসনব্যবস্থা। 'সমাজতন্ত্র' বলতে তিনি জনগণের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপযোগী ব্যবস্থা এবং 'জাতীয়তাবাদ' বলতে বিদেশী শাসনমুক্ত স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝিয়েছিলেন। এই তিনটি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শুরু হয়। অচিরেই তাঁর তিন দফা কর্মসূচী চীনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই আদর্শের রূপায়ণ দেখে যাবার আগেই ১৯২৫ খৃস্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়।

চিয়াং-কাইশেক : কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যেকার সম্পর্ক : সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিনটাং-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল চিয়াং-কাইশেক। তিনি সান-এর আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করার ভার নেন। এ সময়ে চীনা জনগণের একাংশ মার্কসবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ১৯২১ খৃস্টাব্দে সাংহাই-তে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎ-সেন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সদ্ভাব বজায় ছিল। চিয়াং-এর আমলে সেই সম্পর্কের অবনতি হয়। তিনি চীনে কমিউনিস্ট প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট হন এবং কুয়োমিনটাং দলের সব কমিউনিস্ট সদস্যকে বহিষ্কার করেন।

চীনের কমিউনিস্টরাও বসে ছিলেন না। তাঁরা চিয়াংকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে চিয়াং-এর নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং বাহিনী উত্তর চীনের সময় নায়কদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাংহাই ও নানকিং দখল করেন। কিন্তু সেই সময় কুয়োমিনটাংদের মধ্যে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন একদল সেনা নানকিং-এ পৃথক সরকার গঠন করে সেখানকার বিদেশীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। ফলে বিদেশীদের সঙ্গে চিয়াং-এর সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে। তিনি ভয় দেখিয়ে দল থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেশ থেকে কমিউনিস্টদের প্রভাব নির্মূল করতে তাঁর সব শক্তি নিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৮ খৃস্টাব্দে চীনা কমিউনিস্ট দল তাদের নিজস্ব বাহিনী লাল ফৌজ গড়ে তুলেছিল। এদের নেতা ছিলেন মাও-সে-তুঙ।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর হুনান প্রদেশের শী-শান গ্রামের এক কৃষক-পরিবারে মাও-সে-তুঙ জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই গ্রামের মানুষদের শোচনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁর মনকে পীড়া দিত। তিনি বুঝতে পারেন, মাঞ্চু রাজাদের অপদার্থতা, বিদেশী শোষণ এবং জাপানীদের আগ্রাসী মনোভাব চীনাদের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। এ সবের অবসানকল্পে তিনি মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯১১ খৃস্টাব্দে মাঞ্চুরাজার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চীনের সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর যুদ্ধের সময় তিনি সাধারণতন্ত্রী বাহিনীতে যোগ দেন। পরে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব তাঁর মনে নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। তিনি মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন।



মাও-সে-তুঙ

চীনে কমিউনিস্ট দল গঠিত হলে তিনি তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে চিয়াং-এর কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপ চীনের কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। বিপদ বুঝতে পেরে তিনি সব কমিউনিস্টদের একত্রিত করেন এবং তাদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি করে চিয়াং-এর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় অগ্রসর হন।

লং-মার্চ ঃ চিয়াং কাইশেক-এর কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি চীনের সব কমিউনিস্টকে একত্রিত হবার সুযোগ দেয়। মাও-এর নেতৃত্বে দেশের কৃষক ও সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ চীনের কিয়াংসি অঞ্চলে এক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে চিয়াং-এর রোষদৃষ্টি এড়াবার জন্য তাঁরা ঠিক করেন কিয়াংসি ছেড়ে তাঁরা অধিকতর

নিরাপদ স্থান সেন-সির পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি গড়বেন। এই উদ্দেশ্যে মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে শুরু হয় কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক দীর্ঘ পদযাত্রা (১৯৩৪ খৃঃ)। এই পদযাত্রাই ইতিহাসে **লং মার্চ** নামে খ্যাত। ৮৫,০০০ সৈন্য এবং ১৫,০০০ কর্মীর এক বিরাট বাহিনী দক্ষিণের কিয়াংসি প্রদেশ থেকে এই ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু করেন। নদী, গিরিখাত, পর্বত, উপত্যকা পার হয়ে সেই দুঃসাহসিক পদযাত্রা



ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। পথে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যেও কমিউনিস্টদের মনোবল অটুট ছিল। এই মনোবলই তাঁদের দিয়েছে চিয়াং-এর কুয়োমিনটাং দলের সঙ্গে লড়াই-এ অনুপ্রেরণা। এক বছর ধরে প্রায় ছ'হাজার মাইল দীর্ঘ এক বিপদ-সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে লাল ফৌজ শেষ পর্যন্ত উত্তরে ইয়েনান প্রদেশে এসে পৌঁছায় (১৯৩৫ খৃঃ)। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা, শত্রুপক্ষের আক্রমণ, খাদ্যাভাব, জলকষ্ট ইত্যাদির মধ্যেও কমিউনিস্টদের যাত্রা অব্যাহত ছিল। এই মনোবলই শেষ পর্যন্ত তাদের চিয়াং কাইশেক-এর কুয়োমিনটাং দলের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছিল।

চিয়াং কাইশেক-এর কমিউনিস্ট দলন নীতি এখানেও অব্যাহত থাকে। সেন-সিতে তিনি একদল সৈন্য পাঠান কমিউনিস্টদের রুখতে। এই সময় জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ তাঁকে কিছুটা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এদিকে চীনের অখণ্ডতার স্বার্থে কমিউনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিয়াংকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু চিয়াং জাপান অপেক্ষা চীনের কমিউনিস্টদের দমন করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কমিউনিস্ট বিরোধী নীতি জাতীয় বাহিনীর পছন্দ না হওয়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অনুগামী ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে **সিয়াং ফুতে** চিয়াংকে বন্দী করেন। এই ঘটনা **সিয়াং ফু ঘটনা** নামে পরিচিত। পরে জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলে চিয়াংকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় মাও-সে-তুং যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহীদের হাতে চিয়াংকে মরতে হত। কিন্তু তাঁর কাছে চিয়াং অপেক্ষা জাপান ছিল বেশী মারাত্মক। তাই ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে চীনের ওপর জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান। এতে চীনে তাঁর মর্যাদা বেড়ে যায়, বিশেষতঃ কুয়োমিনটাংদের কাছে। তাঁরই চেষ্টায় প্রধানতঃ কমিউনিস্টদের এবং জাতীয়তাবাদীরা একযোগে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

এরই মধ্য ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪১ খৃস্টাব্দে জাপান সেই যুদ্ধে যোগদান করে। মাও-এর কমিউনিস্ট দল এবং চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী দল একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যদিও চিয়াং ছিলেন তখনও ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। যাইহোক, এই যুদ্ধে কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাংদের মিলিত সংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের মান মর্যাদা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান : চীনের গৃহযুদ্ধ : ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে চীন-জাপান যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। চীনের মাটি থেকে জাপানী ভীতি দূর হলে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যে আবার শুরু হয়ে যায় ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই লড়াই ক্রমশঃ গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্টরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এদের নেতা মাও-সে-তুঙ, চৌ-এন-লাই-এর পিছনে ছিল দেশের দরিদ্র এবং মেহনতি মানুষ। অন্যদিকে চিয়াং-এর জাতীয় বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করতেন ধনী জমিদার ও বণিক সম্প্রদায়। চীনের বিপুল গণশক্তির তুলনায় তাঁদের শক্তি ছিল নগণ্য। ফলে চিয়াং

কাইশেকের জাতীয় বাহিনী কমিউনিস্টদের দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্টরা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পরে একের পর এক শহর দখল করে সমগ্র চীনা ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কমিউনিস্টরা চীনের রাজধানী পিকিং দখল করেন। চিয়াং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন। এই দ্বীপের পরে নামকরণ হয় তাইওয়ান। ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। মাও-সে-তুঙ হন প্রজাতান্ত্রিক চীনের চেয়ারম্যান।

অনুশীলনী

১। চীনে প্রজাতন্ত্রের বিভাজন কীভাবে শুরু হয়?

২। সান-ইয়াৎ-সেনের আমলে চীনের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। তাঁর তিন দফা সূত্র কী কী?

৩। কমিউনিস্টদের প্রতি চিয়াং কাইশেকের মনোভাব কেমন ছিল? তাঁর শেষ পরিণতি কী হয়?

৪। কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্টদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৫। মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়?

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:

তু-চুন; লং মার্চ; সিয়াং ফু ঘটনা; ৪ঠা মে'র আন্দোলন; গৃহযুদ্ধ।

৭। চীনের ইতিহাসে নিম্নোক্ত সালগুলি স্মরণীয় কেন?

১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯৩৪, ১৯৩৬, ১৯৪৯।

৮। 'কুয়োমিণ্টাং' বলতে কী বোঝ? এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুই ব্যক্তির নাম কর।

৯। এক একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:—

(ক) চিয়াং কাইশেক কোন্ দ্বীপে আশ্রয় নেন?

(খ) এই দ্বীপের বর্তমান নাম কী?

(গ) কোন্ বছর চীন প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়?

(ঘ) প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান কে?

(ঙ) চীনের তৎকালীন রাজধানীর নাম কী ছিল?

১০। প্রজাতান্ত্রিক চীন বলতে কী বোঝ?

● ১৮. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব : ১৯৪৫-এর পরে

ভূমিকা : ভারতের পূর্বদিকে, চীনের দক্ষিণে এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তরে যে ভূখণ্ড তাই সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের দ্বীপগুলি বরাবরই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই দ্বীপগুলিতে এসে উপনীত হয় এবং নিজ নিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে। তারপর থেকে ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। এই সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় ইন্দোচীনের।

(ক) **ইন্দোচীন :** তিনটি ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া এবং লাওস নিয়ে গড়া এই বিশাল উপদ্বীপটি প্রথম থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। ১৯30 খৃস্টাব্দে হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে এখানে সাম্যবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় **ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি** (I.C.P.)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন দখল করে নিয়ে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। একই সঙ্গে চলতে থাকে হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনাম জাতীয় বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ভিয়েত-মিন-বাহিনী হ্যানয় দখল করে ভিয়েতনামে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। হো-চি-মিন হন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।



হো-চি-মিন

এদিকে জাপান পরাজিত হলে ফ্রান্স আবার এই অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব ফিরে পেতে চেষ্টা শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ভিয়েতনামের পদচ্যুত সম্রাট **বাও দাই**-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামে এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ নিয়ে ভিয়েত-মিন-বাহিনী ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। শেষে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জেনেভা চুক্তি অনুসারে ভিয়েতনামকে দু'ভাগ করা হয়—উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

হ্যানয়, টংকিং সহ উত্তর ভিয়েতনামের কর্তৃত্ব পেলেন হো-চি-মিনের সাম্যবাদী সরকার। এর রাজধানী হল **হ্যানয়**। আর দক্ষিণে ফরাসী প্রভাবাধীন বাও দাই সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তার রাজধানী হল **সায়গন**। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে একটানা ত্রিশ বছর চলার পর ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে দুটি দেশ পুনরায় মিলিত হয়। ভিয়েতনামের অন্তর্গত আর দুটি অঞ্চল **কাম্বোডিয়া ও লাওস** পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে কাম্বোডিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলেও সে সরকার দেশের সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁকে সরিয়ে কাম্বোডিয়ার সাম্যবাদী দল ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করে। লাওস-এও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে সেখানেও প্রিন্স সুফানুভঙ্গ-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী **প্যাথেট-লাও** সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।



ব্রহ্মদেশ ঃ ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটা অংশ। পরে এই দেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটি উপনিবেশে পরিণত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানীরা ব্রিটিশের হাত থেকে ব্রহ্মদেশ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মনোনীত **ডঃ ব. ম**-কে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান করে। কিন্তু যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জাপান

পরাজিত হলে ব্রিটিশ পুনরায় ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে **জেনারেল অঙ-সান-**এর নেতৃত্বে ফ্যাসি বিরোধী বর্মীদের জাতীয় বাহিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ বর্মীদের স্বাধীনতার দাবী মেনে নেয়; ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ব্রহ্মদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। **ইউ নু** হন তার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ২রা মার্চ **জেনারেল নে উইন** ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক আইন জারী করেন।

মালয়েশিয়া ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, সিঙ্গাপুর, পেনাং সারাওয়াক প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত মালয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে জাপান এই অঞ্চলগুলির দখল নেয়। কিন্তু ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ মালয় অধিকার করে। যেহেতু মালয় ছিল ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চলের সমন্বয়ে গড়া, সেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত এই সব অঞ্চলের নেতারা একযোগে কাজ করতে স্বীকৃত হলে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে এগারোটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে মালয় যুক্তরাষ্ট্র বা **মালয়েশিয়া** গঠিত হয়। তখন থেকেই স্বাধীন দেশ হিসাবে মালয়েশিয়া পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায়। টুঙ্কু আবদুল রহমান হন এর প্রধানমন্ত্রী। সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে সিঙ্গাপুর দ্বীপটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ইন্দোনেশিয়া ঃ সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, সিলিবিস, মলাক্কা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া ছিল ওলন্দাজদের অধীন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে ডঃ সুকর্ন-র নেতৃত্বে গঠিত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল এখানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এর আগে ১৯২০ খৃস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদের কাছ থেকেও প্রতিরোধ এসেছিল। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার শক্ত হাতে সে সব আন্দোলন দমন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ওলন্দাজরা জার্মানদের কাছে পরাজিত হলে জাপান এই ভূখণ্ড দখল করে। কিন্তু ১৯৪৫-এ জাপানের আত্মসমর্পণের পর সুকর্ন-র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর মধ্যে ডাচরা পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। শেষপর্যন্ত ওলন্দাজরা পরাজিত হয় এবং ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে (১৯৪৯ খৃঃ)। ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ সুকর্ন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

অনুশীলনী

১। ১৯৩০ থেকে ১৯৭৫—এই সময়সীমায় ভিয়েতনামের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনে হো-চি-মিন-এর অবদান কী ?

৩। ব্রহ্মদেশ কীভাবে স্বাধীন হয় ? 'মালয়েশিয়া'র পুনর্গঠনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৪। ডঃ সুকর্ন-র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় কীভাবে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৫। কে কোন্ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ?

হো-চি-মিন, নে-উইন, টুঙ্কু আবদুল রহমান, ডঃ সুকর্ন।

১৯. জাতীয়তাবাদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতন্ত্রের পথে বিশ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাতীয়তাবাদের বিকাশ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে। একদিকে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও সাম্যবাদী আদর্শ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসি ও নাৎসীবাদ। শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শের কাছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ পরাজিত হয়। ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদের এই পরাজয় দেশে দেশে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষও ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন দেশ ও জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা ঘোষণা করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর পরাধীন জাতিসমূহ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশগুলি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত আফ্রিকার পরাধীন দেশ-গুলির মানুষের মনেও নবচেতনার সঞ্চার হয়। জাতিগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য ঐসব অঞ্চলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বজুড়ে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ। যার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অসংখ্য পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়।

অতলান্তিক সনদ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন, রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪১ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বুকে ভাসমান এক জাহাজে মিলিত হয়ে একটি সনদে স্বাক্ষর করেন। পরের বছর ভারতসহ আরও ২৬টি দেশ এই ঘোষণাপত্রে সই করলে এটি অতলান্তিক সনদ (Atlantic Character) নামে পরিচিত হয়। অতলান্তিক সনদে মোট আটটি শর্ত ছিল। এই শর্তাবলীর মূল বক্তব্য হল, অতঃপর বিশ্বের জাতিসমূহ নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার ভিত্তিতে পরস্পর সদ্ভাব ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করে চলবে। বাস্তবিক পক্ষে এই সনদই ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঃ এরপর তেহেরান সম্মেলন, মস্কো সম্মেলন ইত্যাদি একাধিক সম্মেলনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সই করেন। ঐ বছরের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের** (U. N. O.) প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্বসংস্থার উদ্দেশ্য হল—(১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা ; (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা ; (৩) বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবতা সংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান এবং মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির প্রতি মর্যাদাদানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। এর ছয়টি শাখা, যথা—(১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং (৬) সদর কার্যালয়।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের আরও কয়েকটি বিশেষ শাখা (**Specialised Agency**) আছে। এগুলির অন্যতম হল, ইউনেসকো (**UNESCO**), ইউনিসেফ (**UNICEF**), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (**FAO**), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (**WHO**), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (**ILO**) ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলি বিশ্বের বিকাশশীল দেশসমূহে শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, খাদ্য ও কৃষি গবেষণা, শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ত কাজ করে চলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পৃথিবী বেশ কয়েকবার যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এর সদস্যগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেইসব যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছে বা যুদ্ধের সম্ভাবনাকের অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনে এবং বিকাশশীল দেশসমূহের সর্বাত্মক উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না।

সাম্যবাদী আদর্শের সাফল্য—উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং সাম্যবাদী আন্দোলন ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্যবাদীদের সাফল্য সর্বত্র মুক্তিকামী জনগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। স্বাধীনতা আপাতঃ লক্ষ্য বলে স্থির হল বটে, কিন্তু নেতৃবৃন্দ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। বিশেষতঃ অনগ্রসর দেশগুলিতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান না রাখা, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, দেশের অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ

কল্যাণ সাধন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। অনেকের মনেই এ ধারণা জাগে যে একমাত্র সমাজবাদের পথেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব। ফলে একদিকে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, যার লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভ, অন্য দিকে শুরু হয় সাম্যবাদী আন্দোলন ; যার উদ্দেশ্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী, চীন প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে। এদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয়যুক্ত হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অসংখ্য দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়। আমাদের ভারতবর্ষ এই সাম্যবাদী আদর্শকে অনুসরণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে।

অনুশীলনী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনীতিতে কী কী পরিবর্তন সূচিত করেছিল ?

২। অতলান্তিক সনদ কী ? এর শর্তাবলীর মূল বক্তব্য লেখ।

৩। কীভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় ? এর উদ্দেশ্য কী ? জাতিপুঞ্জের প্রধান শাখা কয়টি এবং কী কী ?

৪। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্যবাদী আদর্শ কীভাবে জয়যুক্ত হয় ?

৫। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) অতলান্তিক সনদে প্রথম কে কে স্বাক্ষর করেন ? (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা কবে হয় ? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে প্রথম কয়টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেন ?

৬। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ কয়েকটি সংস্থার নাম কর। কোন্‌টি কিসের সঙ্গে যুক্ত ?

পরিশিষ্ট

● কালানুক্রমিক ঘটনাবলী ●

খ্রীস্টাব্দ	ঘটনাবলী
১৪৫৩	তুরস্কের কনস্ট্যাণ্টিনোপল জয়
১৪৯২	কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার
১৪৯৮	ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন
১৫২৬	পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ
১৫২৭	খানুয়ার যুদ্ধ
১৫৩৯	জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা
১৫৪৬	মার্টিন লুথারের মৃত্যু
১৫৫৬	পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
১৫৭৬	হলদিঘাটের যুদ্ধ
১৬০০	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ লাভ
১৬০৫	আকবরের মৃত্যু
১৬২৭ (১৬৩০ ?)	শিবাজীর জন্ম
১৬৪৪	মাঞ্চু রাজত্বের সূত্রপাত
১৬৪৮	ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান
১৬৪৯	রাজা প্রথম চার্লস-এর প্রাণদণ্ড
১৬৫৮	ঔরঙ্গজীবের সিংহাসনে আরোহণ
১৬৬০	ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা
১৬৮৮	ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব
১৬৯০	কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা
১৭০৭	ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু
১৭৩৯	নাদির শাহের ভারত আক্রমণ
১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ ; আলিনগরের সন্ধি
১৭৫৯	বিদেরার যুদ্ধ
১৭৬১	পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ

খ্রীস্টাব্দ	ঘটনাবলী
১৭৬৫	ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ
১৭৭৫	আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম
১৭৭৬	ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ; বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার
১৭৮৯	ফরাসী বিপ্লব
১৭৯২	ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
১৭৯৩	ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড
১৮১৫	ওয়াটারলুর যুদ্ধ ; নেপোলিয়নের পতন ; ভিয়েনা সম্মেলন
১৮১৮	কার্ল মার্কস-এর জন্ম
১৮৪০-৪২	প্রথম চীন যুদ্ধ
১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৫৮	ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান
১৮৬৩-৬৫	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ
১৮৬২	প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরূপে বিসমার্কের কার্যভার গ্রহণ
১৮৬৭	জাপানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
১৮৭০-৭১	তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয় ; ইতালি ও জার্মানীর ঐক্য সাধন
১৮৮৫	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৮৯৪-৯৫	চীন-জাপান যুদ্ধ
১৯০৪-০৫	রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়
১৯০৫	বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের শুরু
১৯০৭	সুরাট অধিবেশন ; কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের উদ্ভব
১৯১১	চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
১৯১৪-১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
১৯১৭	বলশেভিক বিপ্লব
১৯১৯	ভার্সাই চুক্তি, লীগ অফ নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠা
১৯২০	অসহযোগ আন্দোলনের শুরু
১৯২৪	লেনিন-এর মৃত্যু

খ্রীস্টাব্দ	ঘটনাবলী
১৯২৫	সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যু
১৯৩০	আইন অমান্য আন্দোলন
১৯৩৩	হিটলারের ক্ষমতা দখল
১৯৩৫	স্পেনে গৃহযুদ্ধ ; ভারত শাসন আইন
১৯৩৮	মিউনিখ চুক্তি
১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু
১৯৪১	অতলান্তিক সনদ
১৯৪২	ভারত ছাড়ো আন্দোলন
১৯৪৩	আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা
১৯৪৫	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা
১৯৪৭	ভারতের স্বাধীনতা লাভ
১৯৪৮	ব্রহ্মদেশে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
১৯৪৯	প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে চীনের অভ্যুদয় ; স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রূপে ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতি লাভ
১৯৫০	স্বাধীন ভিয়েৎনামের জন্ম, ভারতে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
১৯৫৭	স্বাধীন মালয়েশিয়ার জন্ম